শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ছোটদের ভূতের গল্প

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দীপ প্রকাশন
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

আমার পৌত্রী শ্রীমতী নীরাজনা মুখোপাধ্যায়কে

ভূমিকা

আমি ছোটোদের জন্য সবসময় মজার গল্পই লিখি। সেইসব মজাকে কেন্দ্র করেই অনেক সময় ভূত আসে, রহস্য আসে কিংবা কল্পবিজ্ঞানের অবতারণা হয়। আসলে আমার শৈশবে কল্পনার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল বিটকেল ব্যাপারস্যাপার। নানান অদ্ভুত, কিম্ভূত, বিচিত্র সব অনুষঙ্গ আমার মাথায় ভর করত সবসময়। তারই নানান বিচ্ছুরণ প্রকাশ পেয়েছে এইসব রচনায়। ভালো—মন্দ জানিনা, আমার মাথায় যা ভর করে তাই লিখি। তাই লিখেছি। আমার সেই বিচিত্র অভিযাত্রায় যদি একালের ছোটোরাও আমার সঙ্গী হয়— তাহলে তো চমৎকার!

দীপ প্রকাশন ছোটোদের জন্য আমার লেখা গল্পগুলিকে নিয়ে কয়েকটি বই প্রকাশ করতে চলেছেন। ওঁদের ধন্যবাদ। আর ভালোবাসা জানাই, আমার দীর্ঘদিনের স্নেহাস্পদ তরুণ কবি শ্রী অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যে এই গল্পগুলিকে খুঁজেপেতে জোগাড় করেছে।

সূচিপত্র

গন্ধটা খুব সন্দেহজনক

সেবার আমার দিদিমা পড়লেন ভারি বিপদে।

দাদামশাই রেল কোম্পানিতে চাকরি করতেন, সে আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। আমার মা তখনও ছোট্ট ইজের—পরা খুকি। তখন এতসব শহর নগর ছিল না, লোকজনও এত দেখা যেত না। চারধারে কিছু গাছগাছালি জঙ্গল টঙ্গল ছিল। সেইরকমই এক নির্জন জঙ্গুলে জায়গায় দাদামশাই বদলি হলেন। উত্তর বাংলার দোমোহানীতে। মালগাড়ির গার্ড ছিলেন, তাই প্রায় সময়েই তাঁকে বাড়ির বাইরে থাকতে হত। কখনো একনাগাড়ে তিন—চার কিংবা সাতদিন। তারপর ফিরে এসে হয়তো একদিন মাত্র বাসায় থাকতেন, ফের মালগাড়ি করে চলে যেতেন। আমার মায়েরা পাঁচ বোন আর চার ভাই। দিদিমা এই মোট ন—জন ছেলেমেয়ে নিয়ে বাসায় থাকতেন। ছেলেমেয়েরা সবাই তখন ছোটো ছোটো, কাজেই দিদিমার ঝামেলার অন্ত নেই।

এমনিতে দোমোহানী জায়গাটা ভারি সুন্দর আর নির্জন স্থান। বেঁটে বেঁটে লিচু গাছে ছাওয়া, পাথরকুচি ছড়ানো রাস্তা, সবুজ মাঠ, কিছু জঙ্গল ছিল। লোকজন বেশি নয়! একধারে রেলের সাহেবদের পাকা কোয়ার্টার, আর অন্যধারে রেলের বাবুদের জন্য আধপাকা কোয়ার্টার, একটা ইস্কুল ছিল ক্লাস এইট পর্যন্ত। একটা রেলের ইনস্টিটিউট ছিল, যেখানে প্রতি বছর দু—তিনবার কেদার রায় বা টিপু সুলতান নাটক হত। রেলের বাবুরা দল বেঁধে গ্রীষ্মকালে ফুটবল খেলতেন, শীতকালে ক্রিকেট। বড়ো সাহেবরা সে—খেলা দেখতে আসতেন। মাঝে মাঝে সবাই দল বেঁধে তিস্তা নদীর ধারে বা জয়ন্তিয়া পাহাড়ে চড়ুইভাতিতেও যাওয়া হত। ছোটো আর নির্জন হলেও বেশ আমুদে জায়গা ছিল দোমোহানী।

দোমোহানীতে যাওয়ার পরই কিন্তু সেখানকার পুরোনো লোকজনেরা এসে প্রায়ই দাদামশাই আর দিদিমাকে একটা বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার করে দিয়ে যেতেন। কেউ কিছু ভেঙে বলতেন না। যেমন স্টোরকিপার অক্ষয় সরকার দাদামশাইকে একদিন বলেন, 'এ জায়গাটা কিন্তু তেমন ভালো নয় চাটুজ্যে। লোকজন সব বাজিয়ে নেবেন। হুটহাট যাকে তাকে ঘরে দোরে ঢুকতে দেবেন না।' কিংবা আর একদিন পাশের বাড়ির পালিত—গিন্নি এসে দিদিমাকে হেসে হেসে বলে গেলেন, 'নতুন এসেছেন, বুঝবেন সব আস্তে আস্তে। চোখ কান নাক সব খোলা রাখবেন কিন্তু। ছেলেপুলেদের সামলে রাখবেন। এখানে কারা সব আছে, তারা ভালো নয়।'

দিদিমা ভয় খেয়ে বলেন, 'কাদের কথা বলছেন দিদি?'

পালিত—গিন্নি শুধু বললেন, 'সে আছে, বুঝবেনখন।'

তারপর থেকে দিদিমা একটু ভয়ে ভয়েই থাকতে লাগলেন।

একদিন হল কী, পুরোনো ঝি সুখীয়ার দেশ থেকে চিঠি এল যে, তার ভাসুরপোর খুব বেমার হয়েছে, তাই তাকে যেতে হবে। একমাসের ছুটি নিয়ে সুখীয়া চলে গেল। দিদিমা নতুন ঝি খুঁজছেন, তা হঠাৎ করে পরদিন সকালেই একটা আধাবয়সি বউ এসে বলল, 'ঝি রাখবেন?'

দিদিমা দোনোমোনো করে তাকে রাখলেন। সে দিব্যি কাজকর্ম করে, খায়দায়, বাচ্চচাদের গল্প বলে ভোলায়। দিন দুই পর পালিত—গিন্নি একদিন সকালে এসে বললেন, 'নতুন ঝি রাখলেন নাকি দিদি? কই দেখি তাকে?'

দিদিমা ডাকতে গিয়ে দেখেন কলতলায় এঁটো বাসন ফেলে রেখে ঝি কোথায় হাওয়া হয়েছে! অনেক ডাকাডাকিতেও পাওয়া গেল না। পালিত—গিন্নি মিচকি হাসি হেসে বললেন, 'ওদের সব ওরকমই ধারা। ঝিটার নাম কী বলুন তো?'

দিদিমা বললেন, 'কমলা'।

পালিত—গিন্নি মাথা নেড়ে বললেন, 'চিনি, হালদার—বাড়িতেও ওকে রেখেছিল।'

দিদিমা অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

পালিত—গিন্নি শুধু শ্বাস ফেলে বললেন, 'সব কী খুলে বলা যায়? এখানে এই হচ্ছে ধারা। কোনটা মানুষ আর কোনটা মানুষ নয় তা চেনা ভারি মুশকিল। এবার দেখেশুনে একটা মানুষ ঝি রাখুন।

এই বলে চলে গেলেন পালিত—গিন্নি, আর দিদিমা আকাশপাতাল ভাবতে লাগলেন।

কমলা অবশ্য একটু বাদেই ফিরে এল। দিদিমা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

সে মাথা নীচু করে বলল, 'মা, লোকজন এলে আমাকে সামনে ডাকবেন না, আমি বড়ো লজ্জা পাই।'

কমলা থেকে গেল। কিন্তু দিদিমার মনের খটকা—ভাবটা গেল না।

ওদিকে দাদামশাইয়েরও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। একদিন লাইনে গেছেন। নিশুতিরাতে মালগাড়ি যাচ্ছে ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। দাদামশাই ব্রেকভ্যানে বসে ঝিমোচ্ছেন। হঠাৎ গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। তা মালগাড়ি যেখানে—সেখানে দাঁড়ায়। স্টেশনের পয়েন্টসম্যান আর অ্যাসিসট্যান্ট স্টেশন—মাস্টাররা অনেক সময়ে রাতবিরেতে ঘুমিয়ে পড়ে, সিগন্যাল দিতে ভুলে যায়। সে—আমলে এরকম হামেশা হত। সেরকমই কিছু হয়েছে ভেবে দাদামশাই বাক্স থেকে পঞ্জিকা বের করে পড়তে লাগলেন, পঞ্জিকা পড়তে তিনি বড়ো ভালোবাসতেন। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। হঠাৎ দাদামশাই শুনতে পেলেন, ব্রেকভ্যানের পিছনে লোহার সিঁড়ি বেয়ে কে যেন গাড়ির ছাদে উঠছে। দাদামশাই মুখ বার করে কাউকে দেখতে পেলেন না। ফের শুনলেন, একটু দূরে কে যেন ওয়াগনের পাল্লা খোলার চেষ্টা করছে। খুব চিন্তায় পড়লেন দাদামশাই। ডাকাতরা অনেক সময় সাঁট করে সিগন্যাল বিগড়ে দিয়ে গাড়ি থামায়, মালপত্র চুরি করে। তাই তিনি সরেজমিনে দেখার জন্য গাড়ি থেকে হাতবাতিটা নিয়ে নেমে পড়লেন। লম্বা ট্রেন, তার একদম ডগায় ইঞ্জিন। হাঁটতে হাঁটতে এসে দেখেন, লাল সিগন্যাল ইতিমধ্যে সবুজ হয়ে গেছে, কিন্তু ড্রাইভার আর ফায়ারম্যান কয়লার ঢিপির ওপর গামছা পেতে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওদেরও দোষ নেই, অনেকক্ষণ নাগাড়ে ডিউটি দিচ্ছে, একটু ফাঁকা পেয়েছে কী ঘুমিয়ে পড়েছে। বহু ঠেলাঠেলি করে তাদের তুললেন দাদামশাই। তারপর ফের লম্বা গাড়ি পার হয়ে ব্রেকভ্যানের দিকে ফিরে আসতে লাগলেন। মাঝামাঝি এসেছেন, হঠাৎ শোনেন ইঞ্জিন হুইশেল দিল, গাড়িও ক্যাঁচ কোঁচ করে চলতে শুরু করল। তিনি তো অবাক। ব্রেকভ্যানে ফিরে গিয়ে তিনি সবুজ বাতি দেখালে তবে ট্রেন ছাড়ার কথা। তাই দাদামশাই হাঁ করে চেয়ে রইলেন। অবাক হয়ে দেখেন, ব্রেকভ্যান থেকে অবিকল গার্ডের পোশাক পরা একটা লোক হাতবাতি তুলে সবুজ আলো দেখাচ্ছে

ড্রাইভারকে। ব্রেকভ্যানটা যখন দাদামশাইকে পার হয়ে যাচ্ছে তখন লোকটা তাঁর দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে গেল।

বহু কষ্টে দাদামশাই সেবার ফিরে এসেছিলেন।

সেবার ম্যাজিশিয়ান প্রফেসার ভট্টাচার্য চা—বাগানগুলোতে ঘুরে ঘুরে ম্যাজিক দেখিয়ে দোমোহানীতে এসে পৌঁছোলেন। তিনি এলেবেলে খেলা দেখাতেন। দড়িকাটার খেলা, তাসের খেলা, আগুন খাওয়ার খেলা। তা দোমোহানীর মতো গঞ্জ জায়গায় সেই খেলা দেখতেই লোক ভেঙে পড়ল। ভট্টাচার্য স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে প্রথম দৃশ্যে একটু বক্তৃতা করছিলেন, হাতে ম্যাজিকের ছোট্ট কালো একটা লাঠি। বলছিলেন, ম্যাজিক মানেই হচ্ছে হাতের কৌশল, মন্ত্র তন্ত্র নয়, আপনারা যদি কৌশল ধরে ফেলেন তাহলে দয়া করে চুপ করে থাকবেন। কেউ যেন স্টেজে টর্চের আলো ফেলবেন না...ইত্যাদি। এইসব বলছেন, ম্যাজিক তখনও শুরু হয়নি, হঠাৎ দেখা গেল তাঁর হাতের লাঠিটা হঠাৎ হাত থেকে শূন্যে উঠে ডিগবাজি খেল তারপর আবার আস্তে আস্তে ফিরে গেল ম্যাজিশিয়ানের হাতে। প্রথমেই আশ্চর্য খেলা দেখে সবাই প্রচণ্ড হাততালি দিল। কিন্তু প্রফেসর ভট্টাচার্য খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। এর পরের খেলা— ব্ল্যাকবোর্ডে দর্শকেরা চক দিয়ে যা খুশি লিখবেন, আর প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখবাঁধা অবস্থায় তা বলে দেবেন। কিন্তু আশ্চর্য প্রফেসর ভট্টাচার্যের এই খেলাটা মোটেই সেরকম হল না। দর্শকরা কে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন এই নিয়ে এ ওকে ঠেলছেন, প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখের ওপর ময়দার নেচী আর কালো কাপড় বেঁধে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলছেন— চলে আসুন সংকোচের কিছু নেই, আমি বাঘভাল্লুক নই...ইত্যাদি। সে সময়ে হঠাৎ দেখা গেল টেবিলের ওপর রাখা চকের টুকরোটা নিজে থেকেই লাফিয়ে উঠল এবং শূন্যে ভেসে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর লিখতে লাগল, প্রফেসর ভট্টাচার্য ইজ দি বেস্ট ম্যাজিশিয়ান অফ দি ওয়ার্ল্ড। এই অসাধারণ খেলা দেখে দর্শকরা ফেটে পড়ল উল্লাসে, আর ভট্টাচার্য কাঁদো—কাঁদো হয়ে চোখ—বাঁধা অবস্থায় বলতে লাগলেন কী হয়েছে। অ্যাঁ কী হয়েছে! তারপর তিনি আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। আগুন খাওয়ার খেলাতেও আশ্চর্য ঘটালেন তিনি। কথা ছিল, মশাল জ্বেলে সেই মশালটা মুখে পুরে আগুনটা খেয়ে ফেলবেন। তাই করলেন। কিন্তু তারপরই দেখা গেল ভট্টাচার্য হাঁ করতেই তাঁর মুখ থেকে সাপের জিভের মতো আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছে। পরের তাসের খেলা যখন দেখাচ্ছেন, তখনও দেখা গেল, কথা বলতে গেলেই আগুনের হলকা বেরোয়। দর্শকরা দাঁড়িয়ে উঠে সাধুবাদ দিতে লাগল। কিন্তু ভট্টাচার্য খুব কাঁদো—কাঁদো মুখে চার—পাঁচ—সাত গ্লাস জল খেতে লাগলেন স্টেজে দাঁড়িয়েই। তবু হাঁ করলেই আগুনের হলকা বেরোয়।

তখনকার মফসসল শহরের নিয়ম ছিল বাইরে থেকে কেউ এরকম খেলাটেলা দেখাতে এলে তাঁকে কিংবা তাঁর দলকে বিভিন্ন বাসায় সবাই আশ্রয় দিতেন। প্রফেসর ভট্টাচার্য আমার মামারবাড়িতে উঠেছিলেন। রাতে খেতে বসে দাদামশাই তাঁকে বললেন, 'আপনার খেলা গণপতির চেয়েও ভালো। অতি আশ্চর্য খেলা।'

ভট্টাচার্যও বললেন, 'হ্যাঁ, অতি আশ্চর্য খেলা। আমিও এরকম আর দেখিনি!'

দাদামশাই অবাক হয়ে বলেন, 'সে কী! এ তো আপনিই দেখালেন!'

ভট্টাচার্য আমতা আমতা করে বললেন, 'তা বটে। আমিই তো দেখালাম! আশ্চর্য!'

তাঁকে খুবই বিস্মিত মনে হচ্ছিল।

দাদামশাইয়ের বাবা সেবার বেড়াতে এলেন দোমোহানীতে। বাসায় পা দিয়েই বললেন, 'তোদের ঘরদোরে একটা আঁশটে গন্ধ কেন রে?'

সবাই বলল, 'আঁশটে গন্ধ! কই, আমরা তো পাচ্ছি না।'

দাদামশাইয়ের বাবা ধার্মিক মানুষ, খুব পণ্ডিত লোক, মাথা নেড়ে বললেন, 'আলবাত আঁশটে গন্ধ। শুধু তোদের বাসাতেই নয়, স্টেশনে নেমেও গন্ধটা পেয়েছিলাম। পুরো এলাকাতেই যেন আঁশটে—আঁশটে গন্ধ একটা।'

কমলা দাদামশাইয়ের বাবাকে দেখেই গা ঢাকা দিয়েছিল, অনেক ডাকাডাকিতেও সামনে এল না। দিদিমার তখন ভারি মুশকিল। একা হাতে সব করতে কম্মাতে হচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সব দেখে শুনে খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এসব ভালো কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।'

সেদিনই বিকেলে স্টেশনমাস্টার হরেন সমাদ্দারের মা এসে দিদিমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'কমলা আমাদের বাড়িতে গিয়ে বসে আছে। তা বলি বাছা, তোমার শ্বশুর ধার্মিক লোক, সে ভালো। কিন্তু উনি যদি জপতপ বেশি করেন, ঠাকুরদেবতার নাম ধরে ডাকাডাকি করেন, তাহলে কমলা এ—বাড়িতে থাকে কী করে?'

দিদিমা অবাক হয়ে বলেন, 'এসব কী কথা বলছেন মাসিমা? আমার শ্বশুর জপতপ করলে কমলার অসুবিধে কী?'

সমাদ্দারের মা তখন দিদিমার থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, 'ও হরি, তুমি বুঝি জানো না? তাই বলি বাছা, দোমোহানীর সবাই জানে যে, এ হচ্ছে ওই দলের রাজত্ব। ঘরে ঘরে ওরাই সব ঝি—চাকর খাটছে। বাইরে থেকে চেহারা দেখে কিছু বুঝবে না, তবে ওরা হচ্ছে সেই তারা।'

'কারা?' দিদিমা তবু অবাক।

'বুঝবে বাপু, রোসো।' বলে সমাদ্দারের মা চলে গেলেন।

তা কথাটা মিথ্যে নয়। দোমোহানীতে তখন ঝি—চাকর কিংবা কাজের লোকের বড়ো অভাব। ডুয়ার্সের ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, মশা আর বাঘের ভয়ে কোনো লোক সেখানে যেতে চায় না। যাদের না গিয়ে উপায় নেই তারাই যায়। আর গিয়েই পালাই—পালাই করে। তবু ঠিক দেখা যেত, কারও বাসায় ঝি—চাকর বা কাজের লোকের অভাব হলেই ঠিক লোক জুটে যেত। স্টেশনমাস্টার সমাদ্দারের ঘরে একবার দাদামশাই বসে গল্প করছিলেন। সমাদ্দার একটা চিঠি লিখছিলেন, সেটা শেষ করেই ডাকলেন, 'ওরে, কে আছিস?' বলামাত্র একটা ছোকরামতো লোক এসে হাজির। সমাদ্দার তার হাতে চিঠিটা দিয়ে বললেন, 'যা, এটা ডাকে দিয়ে আয়।' দাদামশাই তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকটাকে নতুন রেখেছেন নাকি? সমাদ্দার মাথা নেড়ে বলেন, 'না না, ফাইফরমাশ খেটে দিয়ে যায় আর কী। খুব ভালো ওরা ডাকলেই আসে। লোকটোক নয় ওরা ওরাই।'

তো তাই। মামাদের বাড়িতে প্রাইভেট পড়াতেন ধর্মদাস নামে একজন বেঁটে আর ফরসা ভদ্রলোক। তিনি থিয়েটারে মেয়ে সেজে এমন মিনি গলায় মেয়েলি পার্ট করতেন যে, বোঝাই যেত না তিনি মেয়ে না ছেলে। সেবার সিরাজদ্দৌলা নাটকে তিনি লুৎফা। গিরীশ ঘোষের নাটক। কিন্তু নাটকের দিনই তাঁর ম্যালেরিয়া চাগিয়ে উঠল। লেপচাপা হয়ে কোঁ—কোঁ করছেন। নাটক প্রায় শিকেয় ওঠে। কিন্তু ঠিক দেখা গেল, নাটকের সময়ে লুৎফার অভাব হয়নি। একেবারে ধর্মদাস মাস্টারমশাই যেন গোঁফ কামিয়ে আগাগোড়া নিখুঁত অভিনয় করে গেলেন। কেউ কিছু টের পেল না। কিন্তু ভিতরকার কয়েকজন ঠিকই জানত, যে, সেদিন ধর্মদাস মাস্টারমশাই স্টেজে নামেননি। নাটকের শেষে সমাদ্দার দাদামশাইয়ের সঙ্গে ফিরে আসছিলেন, বললেন, 'দেখলেন, কেমন কার্যোদ্ধার হয়ে গেল, একটু খোনাসুরও কেউ টের পায়নি।'

দাদামশাই তখন চেপে ধরলেন সমাদ্দারকে 'মশাই, রহস্যটা কী একটু খুলে বলবেন?'

সমাদ্দার হেসে শতখান হয়ে বললেন, 'সবই তো বোঝেন মশাই। একটা নীতিকথা বলে রাখি, সদ্ভাব রাখলে সকলের কাছ থেকেই কাজ পাওয়া যায়। কথাটা খেয়াল রাখবেন।'

মামাদের মধ্যে যারা একটু বড়ো, তারা বাইরে খেলে বেড়াত। মা আর বড়োমাসি তখন কিছু বড়ো হয়েছে। অন্য মামা—মাসিরা নাবালক নাবালিকা। মা—র বড়ো লুডো খেলার নেশা ছিল। তো মা আর মাসি রোজ দুপুরে লুডো পেড়ে বসত, তারপর ডাক দিত, 'আয় রে। অমনি টুক করে কোথা থেকে মায়ের বয়সিই দুটো মেয়ে হাসিমুখে লুডো খেলতে বসে যেত। মামাদের মধ্যে যারা বড়ো হয়েছে সেই বড়ো আর মেজো মামা যেত বল খেলতে। দুটো পার্টিতে প্রায়ই ছেলে কম পড়ত। ছোটো জায়গা তো, বেশি লোকজন ছিল

না। কিন্তু কম পড়লেই মামারা ডাক দিত, 'কে খেলবি আয়'।' অমনি চার—পাঁচজন এসে হাজির হত, মামাদের বয়সিই সব ছেলে। খুব খেলা জমিয়ে দিত।

এই খেলা নিয়েই আর একটা কাণ্ড হল একবার। দোমোহানীর ফুটবল টিমের সঙ্গে এক চা—বাগানের টিমের ম্যাচ। চা—বাগান থেকে সাঁওতাল আর আদিবাসী দুর্দান্ত চেহারার খেলোয়াড় সব এসেছে। দোমোহানীর বাঙালি টিম জুত করতে পারছে না, হঠাৎ দোমোহানীর টিম খুব ভালো খেলা শুরু করল, দুটো গোল শোধ দিয়ে আরও একখানা দিয়েছে। এমন সময়ে চা—বাগান টিমের ক্যাপ্টেন খেলা থামিয়ে রেফারিকে বলল, 'ওরা বারোজন খেলছে।' রেফারি গুনে দেখলেন, না, এগারোজনই। ফের খেলা শুরু হতে একটু পরে রেফারিই খেলা থামিয়ে দোমোহানীর ক্যাপ্টেনকে ডেকে বললেন, 'তোমাদের টিমে চার—পাঁচজন একস্ট্রা লোক খেলছে!'

দুর্দান্ত সাহেব—রেফারি, সবাই ভয় পায়। দোমোহানীর ক্যাপ্টেন বুক ফুলিয়ে বলল, 'গুনে দেখুন'। রেফারি গুনে দেখে আহাম্মক। এগারোজনই।

দোমোহানীর টিম আরও তিনটে গোল দিয়ে দিয়েছে। রেফারি আবার খেলা থামিয়ে ভীষণ রেগে চেঁচিয়ে বললেন, 'দেয়ার আর অ্যাট লীসট টেন একস্ট্রা মেন ইন দিস টিম।'

দর্শকদেরও তাই মনে হয়েছে। গুনে দেখা যায় 'এগারোজন', কিন্তু খেলা শুরু হতেই যেন ঘাসের বুকে লুকিয়ে থাকা, কিংবা বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে থাকা সব খেলোয়াড় পিলপিল করে নেমে পড়ে মাঠের মধ্যে। রেফারি দোমোহানীর টিমকে লাইন আপ করিয়ে সকলের মুখ ভালো করে দেখে বললেন, 'শেষ তিনটে গোল যারা করেছে তারা কই? তাদের তো দেখছি না। একটা কালো ঢ্যাঙা ছেলে, একটা বেঁটে আর ফরসা, আর একটা ষাঁড়ের মতো, তারা কই?'

দোমোহানীর ক্যাপ্টেন মিন মিন করে যে সাফাই গাইল, তাতে রেফারি আরও রেগে টং। চা—বাগানের টিমও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাফসে পড়েছে। কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারছে না।

খেলা অবশ্য বন্ধ হয়ে গেল। দাদামশাইয়ের বাবা লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে খেলার হালচাল দেখে বললেন, 'আবার সেই গন্ধ। এখানেও একটা রহস্য আছে বুঝলে সমাদ্দার?'

স্টেশনমাস্টার সমাদ্দার পাশেই ছিলেন, বললেন, 'ব্যাটারা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।'

'কে কাদের কথা বলছ।'

সমাদ্দার এড়িয়ে গেলেন। দাদামশাইয়ের বাবা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।'

দাদামশাইয়ের বাবা সবই লক্ষ করতেন, আর বলতেন, 'এসব ভালো কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক। ও বউমা, এসব কী দেখছি তোমাদের এখানে? হুট বলতেই সব মানুষজন এসে পড়ে কোত্থেকে, আবার হুশ করে মিলিয়ে যায়। কাল মাঝরাতে উঠে একটু তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হল, উঠে বসে কেবলমাত্র আপনমনে বলেছি একটু তামাক খাই। অমনি একটা কে যেন বলে উঠল, এই যে বাবামশাই, তামাক সেজে দিচ্ছি। অবাক হয়ে দেখি, সত্যিই একটা লোক কলকে ধরিয়ে এনে হুঁকোয় বসিয়ে দিয়ে গেল। এরা সব কারা?'

দিদিমা আর কী উত্তর দেবেন? চুপ করে থাকেন। দাদামশাইও বেশি উচ্চবাচ্য করেন না। বোঝেন সবই। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা কেবলই চারধারে বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়ান, আর বলেন, 'এ ভালো কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।'

মা প্রায়ই তাঁর দাদুর সঙ্গে বেড়াতে বেরোতেন। রাস্তায়ঘাটে লোকজন কারও সঙ্গে দেখা হলে তারা সব প্রণাম বা নমস্কার করে সম্মান দেখাত দাদামশাইয়ের বাবাকে, কুশল প্রশ্ন করত। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা বলতেন, 'রোসো বাপু আগে তোমাকে ছুঁয়ে দেখি, গায়ের গন্ধ শুঁকি তারপর কথাবার্তা।' এই বলে তিনি যাদের সঙ্গে দেখা হত তাদের গা টিপে দেখতেন, শুঁকতেন, নিশ্চিন্ত হলে কথাবার্তা বলতেন। তা তাঁর দোষ দেওয়া যায় না। সেই সময়ে দোমোহানীতে রাস্তায়ঘাটে বা হাটেবাজারে যেসব মানুষ দেখা যেত তাদের

বারো আনাই নাকি সত্যিকারের মানুষ নয়। তা নিয়ে অবশ্য কেউ মাথা ঘামাত না। সকলেরই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

অভ্যাস জিনিসটাই ভারি অদ্ভুত। যেমন বড়োমামার কথা বলি। দোমোহানীতে আসবার অনেক আগে থেকেই তাঁর ভারি ভূতের ভয় ছিল। তাঁরও দোষ দেওয়া যায় না। ওই বয়সে ভূতের ভয় কারইবা না থাকে। তাঁর কিছু বেশি ছিল। সন্ধ্যের পর ঘরের বার হতে হলেই তাঁর সঙ্গে কাউকে যেতে হত। দোমোহানীতে আসার অনেক পরেও সে অভ্যাস যায়নি। একদিন সন্ধ্যেবেলা বসে ধর্মদাস মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছেন একা, বাড়ির সবাই পাড়া—বেড়াতে গেছে। ঠিক সেই সময়ে তাঁর বাথরুমে যাওয়ার দরকার হল। মাস্টারমশাইকে তো আর বলতে পারেন না— আপনি আমার সঙ্গে দাঁড়ান। তাই বাধ্য হয়ে ভিতর বাড়িতে এসে অন্ধকারকে উদ্দেশ্য করে বললেন 'এই শুনছিস?'

অমনি একটা সমবয়সি ছেলে এসে দাঁড়াল, 'কী বলছ?'

'আমি একটু বাথরুমে যাব, আমার সঙ্গে একটু দাঁড়াবি চল তো।'

সেই শুনে ছেলেটা তো হেসে কুটিপাটি, বলল, 'দাঁড়াব কেন? তোমার কীসের ভয়?'

বড়োমামা ধমক দিয়ে বলেন, 'বেশি ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না। দাঁড়াতে বলছি দাঁড়াবি।'

ছেলেটা অবশ্য দাঁড়াল। বড়োমামা বাথরুমের কাজ সেরে এলে ছেলেটা বলল, 'কীসের ভয় বললে না?'

বড়োমামা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ভূতের'।

ছেলেটা হাসতে হাসতেই বাতাসে মিলিয়ে গেল। বড়োমামা রেগে গিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'খুব ফাজিল হয়েছ তোমরা।'

তা এইরকম সব হত দোমোহানীতে। কেউ গা করত না। কেবল দাদামশাইয়ের বাবা বাতাস শুঁকতেন, লোকের গা শুঁকতেন। একদিন বাজার থেকে ফেরার পথে তাঁর হাতে মাছের ছোট্ট খালুই, তাতে শিঙি মাছ নিয়ে আসছিলেন, তো একটা মাছ মাঝপথে খালুই বেয়ে উঠে রাস্তায় পড়ে পালাচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সেই মাছ ধরতে হিমসিম খাচ্ছেন, ধরলেই কাঁটা দেয় যদি। এমন সময়ে একটা লোক খুব সহৃদয়ভাবে এসে মাছটাকে ধরে খালুইতে ভরে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। দাদামশাইয়ের বাবা তাকে থামিয়ে গা শুঁকেই বললেন, 'এ তো ভালো কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক! তুমি কে হে! অ্যাঁ! কারা তোমরা।'

এই বলে দাদামশাইয়ের বাবা তার পথ আটকে দাঁড়ালেন। লোকটা কিন্তু ঘাবড়াল না। হঠাৎ একটু ঝুঁকে দাদামশাইয়ের বাবার গা শুঁকে সেও বলল, 'এ তো ভালো কথা নয়! গন্ধটা বেশ সন্দেহজনক! আপনি কে বলুন তো! অ্যাঁ! কে?'

এই বলে লোকটা হাসতে হাসতে বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দাদামশাইয়ের বাবা আর গন্ধের কথা বলতেন না! একটু গম্ভীর হয়ে থাকতেন ঠিকই, ভূতের অপমানটা তাঁর প্রেস্টিজে খুব লেগেছিল। একটা ভূত তাঁর গা শুঁকে ওই কথা বলে গেছে ভাবা যায়!

লালটেম

লালটেম কারও পরোয়া করে না। সে আছে বেশ। সকালবেলা সে তিনটে মোষ নিয়ে চরাতে বেরোয়। এ জায়গাটা ভারি সুন্দর। একদিকে বেঁটে—বেঁটে চা—বাগানের দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তার। অন্য ধারে বড়ো একটা মাঠ। মাঠের শেষে তিরতিরে একটা ঠান্ডা জলের পাহাড়ি নদী— তাতে সবসময়ে নুড়ি—পাথর গড়িয়ে চলে। নদীর ওপারে জঙ্গল। আর তার পরেই থমথম করে আকাশ তক উঠে গেছে পাহাড়। সামনের পাহাড়গুলো কালচে—সবুজ। দূরের পাহাড়গুলোর শুধু চূড়ার দিকটা দেখা যায়— সেগুলো সকালে সোনারঙের দেখায়, দুপুরে ঝকঝকে সাদা। আর সন্ধ্যের মুখে—মুখে ব্রোঞ্জের মতো কালোয় সোনার রং ধরে থাকে। আর চারপাশে সারাদিন মেঘ—বৃষ্টি—রোদ আর হাওয়ার খেলা। গাছে—গাছে পাখি ডাকে, কাঠবেড়ালি গাছ বায়, নদীর ওপাশে সরল চোখের হরিণ অবাক হয়ে চারদিক দেখতে দেখতে আর থমকে থমকে জল খেতে আসে।

লালটেম বেশ আছে। মোষ নিয়ে সে মাঠে গিয়ে ছেড়ে দেয়। এক জায়গায় বসে কোঁচড় থেকে মুড়ি খায়। নদীর জল খায়। তারপর খেলা করে। তার সঙ্গীসাথি কিছু কম নেই। তারাও সব মোষ, গোরু, বা ছাগল চরাতে আসে। যে যার জীবজন্তু মাঠে ছেড়ে দিয়ে চোর—চোর খেলে, ডান্ডাগুলি খেলে; নদীতে নেমে সাঁতরায়, আরও কত কী করে।

দুপুরের দিকে খুব খিদে পেলে বাড়ি ফিরে লালটেম খায়।

কিন্তু সব দিন খাবার থাকে না। যেদিন থাকে না, সেদিন লালটেম টের পায়। তাই সেদিন সে বাড়ি ফেরে না। দুপুরে সে গাছের পাকা ডুমুর কী আমলকী পেড়ে খায়। বেলের সময় বেল পাড়ে, কখনো বা টক আম বা বাতাবি লেবু পেয়ে যায় বছরের বিভিন্ন সময়ে। তাই খায়। খেয়ে সবচেয়ে বুড়ো আর শক্ত চেহারার মোষ 'মহারাজার' পিঠে উঠে চিৎপাত হয়ে ঘুমোয়।

ছোট্ট ইস্টিশনটার গা ঘেঁষে লালটেমদের ঝোপড়া। তার বাবা পেতলের থালায় সাজিয়ে পেঁড়া বিক্রি করে ট্রেনের সময়ে। বাজারে বড়ো—বড়ো কারবারিদের কাছে ভৈঁসা ঘি বেচে, দুধ দেয় বাড়ি—বাড়ি। তিনটে মোষের মধ্যে দুটো মেয়ে মোষ। মহারাজা পুরুষ। দুটো মেয়ে—মোষই বছরের কোনো—না—কোনো সময়ে দুধ দেয়। বুড়ো মোষটার মরার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর দুটোও বুড়ো হতে চলল। সামনে দুর্দিন। লালটেমদের সংসার বেশ বড়ো। মা ঘুঁটে বিক্রি করে, বাবা দুধ, পেঁড়া, ঘি বেচে। এই করে কোনোরকমে দশজনের সংসার চলে। লালটেমের দাদু আছে, আরও ছয় ভাইবোন আছে। তারা কোনো লেখাপড়া শেখেনি, মাঝে মাঝে মোষের দুধ, ঘি বা পেঁড়া ছাড়া কোনো ভালো খাবার খায়নি, খাটো ধুতি বা শাড়ি ছাড়া ভালো জামাকাপড় পরেনি, তারা একসঙ্গে একশো টাকাও কখনো চোখে দেখেনি।

তবু লালটেম কারও পরোয়া করে না। দিনভর সে মোষ চরায়, সাথিদের সঙ্গে খেলা করে, আর চারদিককার আকাশ—বাতাস—আলো—পাহাড় দেখে চমৎকার সময় কেটে যায়।

একদিন একটা রোগা মানুষ ওপার থেকে শীতের নদীর হাঁটুভর জল হেঁটে পার হয়ে এল। লোকটার গা ময়লা চাদরে ঢাকা, পরনে একটা পাজামা, কাঁধে মস্ত এক পুঁটুলি। লালটেম আর তার সাথিরা অবাক হয়ে লোকটাকে দেখছিল। কারণ, নদীর ওপারের জঙ্গলে বাঘ আছে, বুনো মোষ, দাঁতাল শুয়োর আর গন্ডার আছে, সাপ তো কিলবিল করছে। ওদিকে কেউ যায় না, একমাত্র কাঠুরেরা ছাড়া। তারাও আবার দল বেঁধে যায়, সঙ্গে লাঠি থাকে, বল্লম থাকে, তির—ধনুক থাকে, আর কুড়ুল তো আছেই।

লোকটা জল থেকে উঠেই পোঁটলাটা মাটিতে রেখে একগাল হেসে বলল, 'একটা জিনিস দেখবে?'

'হ্যাঁ—অ্যা লালটেমরা খুব রাজি।'

লোকটা ধীরে—আস্তে পুঁটলির গিঁট খুলে চাদরটা মেলে দিল। লালটেমরা অবাক হয়ে দেখে, ভিতরে কয়েকটা ইট।

তারা সমস্বরে বলে ওঠে, 'এ তো ইট!'

রোগা লোকটা হেসে বলল, 'ইট ঠিকই, তবে সাধারণ ইট নয়। প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরোনো একটা রাজবাড়ির জিনিস। ওই জঙ্গলের মধ্যে আমি সেই রাজবাড়ির খোঁজ পেয়েছি।'

রাজা বা রাজবাড়ি সম্পর্কে লালটেমের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তবে সে জানে, একজন রাজা সোনার রুটি খেতেন। তাঁর রানি যে শাড়ি পরতেন সেটা জ্যোৎস্নার সুতো দিয়ে বোনা।

লোকটা ইটগুলো পুঁটলিতে বেঁধে হাত ঝেড়ে বলল, 'সেই রাজবাড়িটায় অনেক কিছু মাটির নীচে পোঁতা আছে। যে পাবে, সে একলাফে বড়োলোক হয়ে যাবে। তবে কিনা সেখানে যখেরা পাহারা দেয়, সাপ ফণা ধরে আছে। চারদিকে যাওয়া শক্ত।'

লালটেম বলে, 'তুমি তাহলে বড়োলোক হলে না কেন?'

লোকটা অবাক হয়ে বলে, 'আমি! আমি বড়োলোক হয়ে কী করব? দুনিয়াতে আমার কেউ নেই। দিব্যি আছি, ঘুরে—ঘুরে সময় কেটে যায়। রাজবাড়িটা দেখতে পেয়ে আমি শুধু লোককে দেখানোর জন্য কয়েকটা ইট কুড়িয়ে এনেছি। এইতেই আমার আনন্দ।'

লালটেম বলে 'তোমাকে বাঘে ধরল না? সাপে কাটল না? বুনো মোষ তাড়া করল না?'

লোকটা ভালোমানুষের মতো বলে, 'জানোয়ারেরাও বন্ধু আর শত্রু চিনতে পারে। আমি নিরীহ মানুষ, ওরাও সেটা টের পেয়েছিল। তাই কিছু বলেনি।'

লোকটা তারপর গান গাইতে গাইতে মাঠ পেরিয়ে চলে গেল। লালটেম তার সাথিদের সঙ্গে খেলায় মেতে গেল।

পরদিন ভোরবেলায় কোদাল—গাঁইতি হাতে কয়েকজন লোক নদীর ধারে এসে হাজির। তাদের মধ্যে একজন লোককে লালটেম চেনে। সে হল এ অঞ্চলের নামকরা গুন্ডা আর জুয়াড়ি প্রাণধর। লালটেমকে ডেকে সে লোকটা বলল, 'এই ছোঁড়া, ওই জঙ্গলের মধ্যে যাওয়ার রাস্তা আছে?'

লালটেম ভালোমানুষের মতো বলে, 'কাঠুরেদের পায়ে—হাঁটা রাস্তা আছে।'

লোকটা কটমট করে চেয়ে বলে, 'আমরা যে এদিকে এসেছি, খবরদার কাউকে বলবি না।'

লোকগুলো হেঁটে শীতের নদী পার হয়ে ওপাশের জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লালটেমরা মুখ—তাকাতাকি করে নিজেদের মধ্যে খেলা শুরু করে দেয়। কিন্তু একটু বাদেই আবার কোদাল—শাবল হাতে একদল লোক আসে। তারাও জঙ্গলের মধ্যে পথ আছে কিনা জিজ্ঞেস করে, তারপর লালটেমরা যাতে আর কাউকে না বলে সে বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে নদী পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

সারাদিন যে এভাবে কত লোক জঙ্গলের মধ্যে গেল, তার গোনাগুনতি নেই। তাদের মধ্যে কানা—খোঁড়া—বুড়ো—কচি—বড়োলোক—গরিব সবরকম আছে। চোরের মতো হাবভাব সবার। কী যেন গোপন করছে। এদের দলে লালটেম নিজের বাবাকেও দেখে ভারি অবাক হয়।

বাবা লালটেমকে দেখে কিছু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'আমার ফিরতে দু—দিন দেরি হবে। সাবধানে থেকো। মোষগুলোকে যত্নে রেখো। বাড়ি—বাড়ি দুধ দিয়ো, পেঁড়া বেচো, ঘি বিক্রি কোরো।'

বাবা গেল। কিছুক্ষণ পরে একদল ঘুঁটেউলির সঙ্গে মাকেও জঙ্গলে যেতে দেখল লালটেম।

মা কাছে এসে তাকে টেনে নিয়ে বলল, 'আমার ফিরতে একটু দেরি হবে বাবা। একদিন বা দু—দিন। তুমি সব সামলে রেখো।'

সেই রোগা লোকটা গ্রামে—গঞ্জে—হাটে—বাজারে রাজবাড়ির কথা রটিয়ে দিয়ে গেছে। এখন তাই লোভী মানুষেরা চলেছে সেই রাজবাড়ির খোঁজে! লালটেম তাই অবাক হলেও ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

দু—দিন গেল। তিনদিন গেল। লালটেম আর তার সাথিরা রোজ মোষ চরাতে আসে। এসে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ওপারের জঙ্গলের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সকলেরই বাপ—মা, আপনজনেরা জঙ্গলে গেছে। কেউই এখনও ফেরেনি!

দাঁড়িয়ে তারা একটু অপেক্ষা করে। তারপর আবার খেলায় মাতে। নদীতে স্নান করে। গাছে উঠে খাওয়ার যোগ্য ফল—পাকড় খোঁজে। মোষের পিঠে শুয়ে থাকে।

চারদিনের দিন সন্ধ্যেবেলা একটা লোক জঙ্গল থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে ঝপাং করে নদীতে পড়ল। পড়ে আর ওঠে না। লালটেমরা দৌড়ে গিয়ে জল থেকে টেনে তুলে তাকে এপারে নিয়ে আসে।

লোকটা প্রাণধরের এক স্যাঙাত। তার চোখ রক্তবর্ণ, পেটে পিঠে এক হয়ে গেছে খিদেয়, ভালো করে কথা বলতে পারছে না। লালটেম গিয়ে শালপাতায় নদীর জল তুলে এনে তাকে খাওয়ায়। তারপর মকাই ভাজা দেয়।

লোকটা একটু দম পেয়ে বলল, 'সব মিথ্যে কথা। রাজবাড়ি কোথাও নেই। আমরা মাইলের পর মাইল হেঁটে খুঁজেছি। খাবার নেই, জল নেই। সারা পথে নানারকম বিপদ। আমার সঙ্গীরা কোথায় হারিয়ে গেছে!'

এইরকমভাবে দু—চার দিন পরে একটি—দুটি হা—ক্লান্ত লোক ফিরে এসে তাদের বিপদের কথা জানায়। তারা মিথ্যে মিথ্যে হয়রান হয়েছে। বহু লোক বাঘের পেটে গেছে। কিছু মরেছে বুনো হাতি, বুনো মোষ, দাঁতাল শুয়োরের পাল্লায় পড়ে। বহু লোককে সাপে কেটেছে। জঙ্গলে খাবার নেই, জল নেই, পথ নেই। সেখানে গোলকধাঁধার মতো ঘুরে মরতে হয়।

গা—ভরতি জ্বর নিয়ে একদিন লালটেমের বাবা ফেরে। শরীর শুকিয়ে সিকিভাগ হয়ে গেছে। তার ওপর বিড়বিড় বকছে, 'রাজবাড়ি? সোনাদানা! বাপ রে বাপ!'

এর দু—দিন বাদে ফিরল মা। লালটেম দেখল, তার মা এ কয়েকদিনেই খুনখুনে বুড়ি হয়ে গেছে। মাজা বেঁকে যাওয়ায় লাঠিতে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে হাঁটে, মাথার চুল পেকে শনের গুছি, গলার স্বরে একটা কাঁপ ধরেছে।

শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, একে—একে সবাই ফিরে এসেছে। মরেনি কেউ। তবে সকলেরই ভীষণ বিপদ হয়েছিল। নানারকম বিপদ আর কষ্ট সহ্য করে মরতে মরতে ফিরেছে। তবে মানুষগুলো আর আগের মতো

নেই। যুবকরা বুড়ো হয়ে ফিরেছে, বুড়োরা অথর্ব হয়ে গেছে, আমুদে লোকেরা দুঃখী, দুঃখীরা পাথর হয়ে এসেছে। কোনো মানুষই আর আগের মতো নেই।

লালটেম আজকাল মোষ চরাতে চরাতে খুব রাজবাড়ির কথা ভাবে। তার খুব জানতে ইচ্ছা করে, রাজবাড়ির জন্য লোকগুলো হন্যে হয়ে ছুটে গিয়েছিল কেন?

দুপুর গড়িয়ে গেছে। মোষ মহারাজার পিঠে গামছা পেতে চিত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল লালটেম। বুড়ো মোষটা ঘাস খেতে খেতে নদীর ধারে এল। তারপর লালটেমকে পিঠে নিয়ে নদীতে নামল জল খেতে। জল খেয়ে খুব ধীরে ধীরে নদী পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে চলতে লাগল।

লালটেম ঘুম থেকে উঠে হাঁ। এ সে কোথায়? মহারাজা তাকে পিঠে নিয়ে গভীর জঙ্গলের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে। দুপুর শেষ হয়ে রোদে বিকেলের নরম আভা লেগেছে। চারদিকে গভীর স্বরে পাখিরা ডাকছে। পাতা খসে পড়ছে গাছ থেকে। সরসর করে হাওয়া দিচ্ছে। আর চিকড়ি—মিকড়ি আলো—ছায়ায়, সামনেই এক বিশাল বাড়ির ধ্বংসস্তূপ। ভেঙে—পড়া খিলান, গম্বুজ, পাথরের পরি, ফোয়ারা, শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। বাড়ির চূড়ায় এখনও একটা সোনার কলস চিকমিক করছে।

লালটেম অবাক হয়ে চেয়ে আছে তো আছেই। মহারাজা ফোঁস করে একটা শ্বাস ছাড়তে সেই শব্দে লালটেম সচকিত হয়ে মাটিতে নামল লাফ দিয়ে। তাই তো! এই তো সেই রাজবাড়ি মনে হচ্ছে! এক—পা করে দু—পা লালটেম এগোয়।

চারিদিকে শ্যাওলা ধরা পাথর আর ইটের স্তূপ। এই সেই ইট যা রোগা লোকটা তাদের দেখিয়েছিল। সুতরাং এইটাই রাজবাড়ি। লালটেম দেখে, চারধারে নানা রঙের সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু সাপ ফণা তুলছে। ফোঁ ফোঁ করে ভয়ংকর শব্দ করছে তারা। কোত্থেকে একটা দুটো তক্ষক ডাকল। ছমছম করে ওঠে এখানকার নির্জনতা। লালটেম ভয় পায় বটে, কিন্তু তবু এগোয়। সাপেরা তার পথ থেকে সরে যায়।

চারদিকে ফিসফাস শব্দ ওঠে। কারা যেন হিঃ হিঃ করে হেসে ওঠে কাছেই। চারদিকে চেয়ে লালটেম কাউকে দেখতে পায় না। আবার এগোয়।

কী করুণ অবস্থা! বিশাল ঘরের আধখানা ভেঙে পড়ে গেছে, বাকি অর্ধেকটায় ধুলো জঞ্জাল আর আগাছা। মাকড়শার জাল এত ধারালো যে, গায়ে লাগলে, চামড়া চিরে যায়। কাঁকড়া বিছেরা বাসা করে আছে যেখানে—সেখানে, একটা ঘরে শেয়ালের বাচ্চচারা দলা পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, একটা জং—ধরা লোহার সিন্দুকের ওপর নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে একটা দাঁতাল শুয়োর।

একটার পর একটা ভাঙা ঘর পার হয় লালটেম। দেখে, অনেকগুলো বন্ধ কুঠুরি। কৌতূহলবশে সে একটা কুঠুরির দরজা ঠেলা দিতেই দরজাটা মড়াত করে ভেঙে পড়ে গেল। লালটেম ভিতরে ঢুকে ভীষণ অবাক হয়ে দেখে, সেখানে অনেক সোনা—রুপোর বাসন পাঁজা করে রাখা।

পাশের কুঠুরিতে ঢুকে লালটেম হাজার হাজার মোহর দেখতে পেল। তার পাশেরটায় গহনা, হিরে, মুক্তো।

কত কী রয়েছে রাজবাড়িতে। দেখে লালটেম অবাক তো অবাক! সবকিছু সে ছুঁয়ে—ছুঁয়ে, নেড়েচেড়ে দেখে, তারপর আবার যেখানকার জিনিস, সেখানেই রেখে দেয়।

সাতটা কুঠুরির সব—শেষটায় ঢুকে লালটেম দেখে, ধুলোর ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা মানুষের কঙ্কাল! ভীষণ ভয় পেয়ে লালটেম দরজার দিকে পিছু হটে সরে এল।

হঠাৎ কঙ্কালটা নড়ে উঠল। একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ করে কঙ্কালটা বলল, 'লালটেম, যেয়ো না।'

লালটেম ভয় পেয়েও দাঁড়াল।

একবোঝা হাড় নিয়ে খটমট শব্দ করে আস্তে আস্তে কঙ্কালটা উঠে বসে। লালটেম দেখে, কঙ্কালটার পাঁজরের মধ্যে একটা কালো সাপ, মাথার খুলির ভিতর থেকে চোখ আর নাকের ফুটো দিয়ে কাঁকড়াবিছে বেরিয়ে আসছে, আর সারা গায়ে লাল পিঁপড়ে থিকথিক করছে।

কঙ্কালটা হাত তুলে বলে, 'আমার দশা দেখেছ?'

'দেখছি।'

'ভয় পেয়ো না। এখানে যা কিছু দেখছ, সব সোনাদানা মোহর—গয়না, এ সবই তোমার। নিয়ে যাও।

লালটেম মাথা নেড়ে বলে, 'নিয়ে কী হবে?'

'অভাব থাকবে না। খুব বড়োলোক হয়ে যাবে। নাও।'

বাইরে থেকে গম্ভীর গলায় মহারাজা ডাকল 'হাংগা'।

লালটেম চমকে উঠে বলল, 'আমার মোষটার জল তেষ্টা পেয়েছে। আমি যাই।'

'যেয়ো না লালটেম। কিছু নিয়ে যাও।'

মহারাজা আবার ডাকে, 'আঃ—আঃ'।

লালটেম ছটফট করে বলে, 'বেলা বয়ে যাচ্ছে। আমি যাই।'

'তোমার মোষগুলো বুড়ো হয়েছে লালটেম, একদিন মরবে। তখন বড়ো দুর্দিন হবে তোমাদের। এইবেলা বড়োলোক হয়ে যাও।'

মহারাজা বাইরে ভীষণ দাপিয়ে চেঁচায়, 'গাঁ...গাঁ'।

লালটেম একটু হেসে বলে, 'আমার দিন খারাপ যায় না। বেশ আছি।'

কঙ্কালটা রেগে গিয়ে বলে, 'গাঁ—গঞ্জের হাজারো মানুষ যে রাজবাড়ি খুঁজে খুঁজে হয়রান, সেই রাজবাড়ি পেয়েও তুমি বড়োলোক হবে না?'

লালটেম একটু ভেবে বলে, 'না, আমি তো বেশ আছি। চারদিকে কত আনন্দ! কত ফুর্তি!'

সাপটা ফোঁস করে কঙ্কালটার পাঁজরায় একটা ছোবল দিল। 'উঃ' করে কঙ্কালটা পাঁজর চেপে ধরে বলল, 'গত একশো বছর ধরে রোজ ছোবলাচ্ছে রে বাপ।... ইঃ, ওই দেখ, মাথায় ফের কাঁকড়াবিছেটা হুল দিলে...কী যন্ত্রণা!...আচ্ছা লালটেম, বলো তো, বোকা লোকগুলো রাজবাড়িটা খুঁজে পায় না কেন? তোমাদের এত কাছে, জঙ্গলের প্রায় ধার ঘেঁষেই তো রয়েছে তবু খুঁজে পায় না কেন?। আর যে দু—একজন খুঁজে পায়, সেগুলো একদম তোমার মতোই আহাম্মক। লালটেম, লক্ষ্মী ছেলে, যদি একটা মোহরও দয়া করে নাও, তবে আমি মুক্তি পেয়ে যাই। নেবে?'

বাইরে মহারাজা ভীষণ রেগে চেঁচায়, 'গাঁ—আ।'

লালটেম মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বলে, 'নিলেই তো তোমার মতো দশা হবে।'

এই বলে লালটেম বেরিয়ে আসে গটগট করে। মহারাজা তাকে দেখে খুশি হয়ে কান লটপট করে, গা শোঁকে, পা দাপিয়ে আনন্দ জানায়।

পরদিন থেকে আবার লালটেম মোষ চরাতে যায়। সাথিদের সঙ্গে খেলে। পাহাড়, জঙ্গল, নদী, মাঠ, চা—বাগান দেখে তার ভারি আনন্দ হয়। রোদ আর আলো, মেঘ আর বৃষ্টি, বাতাস আর দিগন্ত তাকে কত আদর জানায় নানাভাবে।

কোনোদিন তার খাবার থাকে। কোনোদিন থাকে না। যেদিন খাবার জোটে না, সেদিন সে মহারাজার পিঠে শুয়ে আকাশ দেখে। তার মনে হয়, সে বেশ আছে। খুব ভালো আছে। তার কোনো দুঃখ নেই।

নিশি কবরেজ

হারানো একটা পুথিতে নিশি কবরেজ একটা ভারি জব্বর নিদান পেয়েছেন। গাঁটের ব্যথার যম। তবে মুশকিল হল পাচনটা তৈরি করতে যে পাঁচরকম জিনিস লাগে তার চারটে জোগাড় করা যায়। কিন্তু পাঁচ নম্বরটাই গোলমেলে। পাঁচ নম্বর জিনিসটা হচ্ছে আধ ছটাক ভূত।

নিশি কবরেজ রাতে খাওয়ার পর দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আচমন করছিলেন। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার রাত্রি। চারদিক নিঃঝুম। শীতকালের কুয়াশা আর ঠান্ডাটাও জেঁকে পড়েছে। আঁচাতে আঁচাতে নিশি কবরেজ পাচনটার কথাই ভাবছিলেন। রাজবল্লভবাবু বিরাট বড়োলোক! কিন্তু গাঁটের ব্যথায় শয্যাশায়ী। ব্যথাটা আরাম করতে পারলে রাজবল্লভবাবু হাজার টাকা অবধি দিতে রাজি বলে নিজে মুখে কবুল করেছেন। কিন্তু ভূতটাই সব মাটি করলে। আধ ছটাক ভূত এখন পান কোথায়? হঠাৎ নিশি কবরেজের মনে হল, উঠোনের ওপাশটায় হাঁসের ঘরের পাশটায় কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

—কে রে? ওখানে কে?

কেউ জবাব দিল না।

নিশি কবরেজ জলের ঘটিটা ঘরে রেখে হারিকেন আর লাঠিগাছাটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। দিনকাল ভালো নয়। চোর ছ্যাঁচড়ের দারুণ উপদ্রব। ঘরে কিছু কাঁচা টাকাও আছে। সোনাদানাও মন্দ নেই।

বাঁহাতে হারিকেনটা তুলে ডানহাতের লাঠিটা নাচাতে নাচাতে কয়েক পা এগোতেই উঠোনের ওপাশ থেকে একটু গলাখাঁকারির বিনয়ী শব্দ হল। চোরের তো গলাখাঁকারি দেওয়ার কথা নয়।

—কে রে? ওখানে কে?

ওপাশ থেকে খোনাসুরে জবাব এল। ইয়ে, আমি হলুম গে রামহরি— না, না, থুড়ি, আমি হলুম ধনঞ্জয়।

নিশি কবরেজ আলোটা ভালো করে তুলে ধরে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করতে করতে বললেন, রামহরি বা ধনঞ্জয় নামে এ গাঁয়ে আবার কে আছে? কোথা থেকে আসা হচ্ছে শুনি? দরকারটাই বা কী? রুগি দেখতে হলে রাতে বিশেষ সুবিধা হবে না বলে রাখছি। দিনের বেলা এসো।

কে যেন বলে উঠল, আজ্ঞে ওসব কিছু নয়।

নিশি কবরেজ লোকটাকে ঠিক ঠাহর করতে পারছেন না। তাঁর চোখের জোর কিছু কম নয়। হারিকেনেও কালি পড়েনি। তবু ভালোমতো লোকটাকে দেখতে পাচ্ছেন না। শুধু বুঝতে পারছেন, হাঁসের ঘরের পাশে খুব কালো একটা লম্বাপানা ছায়া ছায়া কী যেন।

নিশি কবরেজ মনে মনে ভাবলেন, এঃ, চোখের বোধহয় বারোটা বাজল এতদিনে। না, কাল থেকে চোখে তিন বেলা ত্রিফলার জল দিতে হবে।

নিশি কবরেজ বললেন, রুগির ব্যাপার নয় তো এত রাতে চাও কী? চোরটোর নও তো বাপু?

—আজ্ঞে না, চোর—ডাকাত হওয়ার উপায়ও নেই কিনা। একটা সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলুম আজ্ঞে।

—সমস্যাটা কী?

—আজ্ঞে বলে দিতে হবে যে আমি রামহরি, না ধনঞ্জয়।

নিশি কবরেজ খ্যাঁক করে উঠে বললেন, ইয়ার্কি হচ্ছে? তুমি রামহরি না ধনঞ্জয় তা আমি কী করে বলব? আমি তোমাকে চিনিই না।

—আজ্ঞে আপনি আমাদের চেনেন— থুড়ি— চিনতেন। আমরা দু—জনেই গেলবার ওলাউঠায় মরলুম, মনে নেই? আপনার পাচন ফেল মারল।

নিশি কবরেজ আঁতকে উঠে বললেন, তোমরা? ওরে বাবা!

—আজ্ঞে ভয় খাবেন না। আমরা ভারি দুর্বল জিনিস।

নিশি কবরেজ কাঁপতে কাঁপতে বললেন, পাচনের দোষ নেই বাবা, সবই কপালের ফের। আমাকে তোমরা মাপ কর।

—আজ্ঞে সেজন্য আপনাকে আমি দুষতে আসিনি। ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু সমস্যা একটা দেখা দিয়েছে। ভূত হওয়ার পর আমরা সব কেমন যেন ধোঁয়াটে মার্কা হয়ে গেলুম। শরীর—টরীর নেই, তবু কী করে যেন আছি। তা আমরা অর্থাৎ আমি আর ধনঞ্জয়— মানে আমি আর রামহরি— মানে কে যে কোন জন তা বলা মুশকিল— তা আমরা দু—জন খুব মাখামাখি করি। খুব বন্ধুত্ব ছিল তো দু—জনে। এ ওর শরীরে ঢুকে যাই, ও এর শরীরে মিশে যায়। কিন্তু ওই মাখামাখি করতে গিয়েই কে যে কোন জন তা গুলিয়ে গেছে।

—বল কী?

—আজ্ঞে সেই কথাটাই তো বলতে আসা। দু—জনে প্রায়ই ঝগড়া লেগে যাচ্ছে। কখনো আমি বলি যে, আমি রামহরি, ও ধনঞ্জয়। কখন ও বলে যে, ও রামহরি আর আমি ধনঞ্জয়।

নিশি কবরেজ এই শীতেও ঘামছিলেন। হাতের হারিকেন আর লাঠি দুই—ই ঠকাঠক করে কাঁপছে। পেটের ভেতরে গুড়গুড় করছে। মাথা ঘুরছে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল, গাঁটের ব্যথার পাচনটার জন্য আধ ছটাক ভূত লাগবে।

নিশি কবরেজ একগাল হাসলেন। তাঁর হাত—পায়ের কাঁপুনি বন্ধ হল। গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, এ আর বেশি কথা কী? তবে এখন তোমার যেমন বেগুন পোড়ার মতো চেহারা হয়েছে তাতে তো কিছু বোঝবার উপায় নেই। একটু ধৌতি দরকার। বেশি কষ্ট হবে না। একটা পাচনের মধ্যে মিনিট দশেক সেদ্দ করে নেব তোমাকে, তাতেই আসল চেহারাটা বেরিয়ে আসবে।

বটে!—বলে কালো জিনিসটা এগিয়ে এল।

নিশি কবরেজ আর দেরি করলেন না। নিশুতিরাতেই পাচনটা উনুনে বসিয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। ভূতটা সেদ্দ হতে হতে মাঝখানেই মাথা তুলে বলে, হল?

নিশি কবরেজ অমনি কাঠের হাতাটা দিয়ে সেটাকে ঠেসে দিতে দিতে বলেন, হচ্ছে হে হচ্ছে। তাড়াহুড়ো করলে কী হয়? তোমার তো আর গায়ে ফোস্কা পড়ছে না হে!

পাচনটা ভোররাতে তৈরি হয়ে গেল। আর আশ্চর্যের বিষয় ভূতের ঝুলকালো রংটাও একটু ফ্যাকাসে মারল। নিশি কবরেজ খুব ভালো করে জিনিসটাকে নিরীক্ষণ করে বললেন, আরে, তুমি তো রামহরি!

ভূতটা এককথায় ভারি খুশি হয়ে বলল, আজ্ঞে বাঁচালেন, ধনঞ্জয়ের কাছে রামহরি গোটা তিনেক টাকা পেত কিনা। ভারি দুশ্চিন্তা ছিল আমার। পেন্নাম হই আজ্ঞে। বলে ভূতটা মিশে গেল।

নিশি কবরেজ পাচনটা বোতলে পুরে নিশ্চিন্ত মনে তামাক খেতে বসলেন, বড্ড ধকল গেছে।

ইঁদারায় গণ্ডগোল

গাঁয়ে একটা মাত্র ভালো জলের ইঁদারা। জল যেমন পরিষ্কার, তেমনি সুন্দর মিষ্টি স্বাদ, আর সেই জল খেলে লোহা পর্যন্ত হজম হয়ে যায়।

লোহা হজম হওয়ার কথাটা কিন্তু গল্প নয়। রামু বাজিকর সেবার গোবিন্দপুরের হাটে বাজি দেখাচ্ছিল। সে জলজ্যান্ত পেরেক খেয়ে ফেলত, আবার উগরে ফেলত। আসলে কী আর খেত! ছোটো ছোটো পেরেক মুখে নিয়ে গেলার ভান করে জিভের তলায় কী গালে হাপিশ করে রেখে দিত।

তা রামুর আর সেদিন নেই। বয়স হয়েছে। দাঁত কিছু পড়েছে, কিছু নড়েছে। কয়েকটা দাঁত শহর থেকে বাঁধিয়ে এনেছে। তো সেই পড়া, নড়া, আর বাঁধানো দাঁতে তার মুখের ভিতর এখন বিস্তর ঠোকাঠুকি, গণ্ডগোল। কোনো দাঁতের সঙ্গে কোনো দাঁতের বনে না। খাওয়ার সময়ে মাংসের হাড় মনে করে, নিজের বাঁধানো দাঁতও চিবিয়ে ফেলেছিল রামু। সে অন্য ঘটনা। থাকগে।

কিন্তু এইরকম গণ্ডগোলে মুখ নিয়ে পেরেক খেতে গিয়ে ভারি মুশকিলে পড়ে গেল সেবার। পেরেক মুখে অভ্যেসমতো এক গ্লাস জল খেয়ে সে বক্তৃতা করছে। 'পেরেক তো পেরেক, ইচ্ছে করলে হাওড়ার ব্রিজও খেয়ে নিতে পারি। সেবার গিয়েওছিলাম খাব বলে। সরকার টের পেয়ে আমাকে ধরে জেলে পোরার উপক্রম। তাই পালিয়ে বাঁচি।'

বক্তৃতা করার পর সে আবার যথানিয়মে ওয়াক তুলে ওগরাতে গিয়ে দেখে, পেরেক মুখে নেই একটাও। বেবাক জিভের তলা আর গালের ফাঁক থেকে সাফ হয়ে জলের সঙ্গে পেটে সেঁদিয়েছে।

টের পেয়েই রামু ভয় পেয়ে চোখ কপালে তুলে যায় আর কী। পেটের মধ্যে আট—দশটা পেরেক! সোজা কথা তো নয়। আট ঘণ্টার মধ্যে পেটের ব্যথা, মুখে গাঁজলা, ডাক্তার কবিরাজ এসে দেখে বলল, 'অন্ত্রে ফুটো, পাকস্থলীতে ছ্যাঁদা, খাদ্যনালি লিক, ফুসফুস ফুটো হয়ে বেলুনের মতো হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। আশা নেই।'

সেই সময়ে একজন লোক বুদ্ধি করে বলল, 'পুরোনো ইঁদারার জল খাওয়াও।'

ঘটিভর সেই জল খেয়ে রামু আধ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সত্যিই লোহা হজম হয়ে গেছে।

ইঁদারার জলের খ্যাতি এমনিতেই ছিল, এই ঘটনার পর আরও বাড়ল। বলতে কী, গোবিন্দপুরের লোকের এই ইঁদারার জল খেয়ে কোনো ব্যামোই হয় না।

কিন্তু ইদানীং একটা মুশকিল দেখা দিয়েছে। ইঁদারায় বালতি বা ঘটি নামালে দড়ি ছিঁড়ে যায়। দড়ি সবসময়ে যে ছেঁড়ে তাও নয়। অনেক সময় দেখা যায়, বালতির হাতল থেকে দড়ির গিঁট কে যেন সযত্নে খুলে নিয়েছে। কিছুতেই জল তোলা যায় না। যতবার দড়ি বাঁধা বালতি নামানো হয় ততবারই এক ব্যাপার।

গাঁয়ের লোকেরা বুড়ো পুরুতমশাইয়ের কাছে গিয়ে পড়ল। 'ও ঠাকুরমশাই, বিহিত করুন।'

ঠাকুরমশাই মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিলেন। দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'ভায়ারা দড়ি তো দড়ি, আমি লোহার শেকলে বেঁধে বালতি নামালাম, তো সেটাও ছিঁড়ে গেল। তার ওপর দেখি, জলের মধ্যে সব হুলুস্থুলু কাণ্ড হচ্ছে। দেখেছ কখনো ইঁদারার জলে সমুদ্রের মতো ঢেউ ওঠে? কাল সন্ধ্যেবেলায় দেখলাম নিজের চক্ষে। বলি, ও ইঁদারার জল আর কারও খেয়ে কাজ নেই।'

পাঁচটা গ্রাম নিয়ে হরিহর রায়ের জমিদারি। রায়মশাই বড়ো ভালো মানুষ ধর্মভীরু, নিরীহ, লোকের দুঃখ বোঝেন। গোবিন্দপুর গাঁয়ের লোকেরা তাঁর দরবারে গিয়ে হাজির।

রায়মশাই কাছারিঘরে বসে আছেন। ফরসা; নাদুস—নুদুস চেহারা।

নায়েবমশাই সামনে গিয়ে মাথা চুলকে বললেন, 'আজ্ঞে গোবিন্দপুরের লোকেরা সব এসেছে দরবার করতে।'

রায়মশাই মানুষটা নিরীহ হলেও হাঁকডাক বাঘের মতো। রেগে গেলে তাঁর ধারে— কাছে কেউ আসতে পারে না। গোবিন্দপুর গাঁয়ের লোকদের ওপর তিনি মোটেই খুশি ছিলেন না। তাঁর সেজোছেলের বিয়ের সময় অন্যান্য গাঁয়ের প্রজারা যখন চাঁদা তুলে মোহর বা গয়না উপহার দিয়েছিল, তখন এই গোবিন্দপুরের নচ্ছার লোকেরা একটা দুধেল গাই দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এসে একগাল হেসে নতুন বউয়ের হাতে সেই গোরু—বাঁধা দড়ির একটা প্রান্ত তুলে দিয়েছিল।

সেই থেকে রায়মশাইয়ের রাগ। গোরুটা যে খারাপ তা নয়। রায়মশাইয়ের গোয়ালে এখন সেইটেই সবচেয়ে ভালো গোরু। দু—বেলায় সাত সের দুধ দেয় রোজ। বটের আঠার মতো ঘন আর মিষ্টি সেই দুধেরও তুলনা হয় না। কিন্তু বিয়ের আসরে গোরু এনে হাজির করায় চারদিকে সে কী ছিছিক্কার! আজও সেই কথা ভাবলে রায়মশাই লজ্জায় অধোবদন হন। আবার রাগে রক্তবর্ণও হয়ে যান।

সেই গোবিন্দপুরের লোকেরা দরবার করতে এসেছে শুনে রায়মশাই রাগে হুংকার ছেড়ে বলে ওঠেন, 'কী চায় ওরা?'

সেই হুংকারে নায়েবমশাই তিন হাত পিছিয়ে গেলেন, প্রজারা আঁতকে উঠে ঘামতে লাগল, স্বয়ং রায়মশাইয়ের নিজের কোমরের কষি পর্যন্ত আলগা হয়ে গেল।

গোবিন্দপুরের মাতব্বর লোক হলেন পুরুত চক্কোত্তিমশাই। তাঁর গালে সবসময়ে আস্ত একটা হত্তুকি থাকে। আজও ছিল। কিন্তু জমিদারমশাইয়ের হুংকার শুনে একটু ভিরমি খেয়ে ঢোঁক গিলে সামলে ওঠার পর হঠাৎ টের পেলেন, মুখে হত্তুকিটা নেই। বুঝতে পারলেন, চমকানোর সময় সেটা গলায় চলে গিয়েছিল, ঢোঁক গেলার সময় গিলে ফেলেছেন।

আস্ত হত্তুকিটা পেটে গিয়ে হজম হবে কী না কে জানে। একটা সময় ছিল, পেটে জাহাজ ঢুকে গেলেও চিন্তা ছিল না! গাঁয়ে ফিরে পুরোনো ইঁদারার একঘটি জল ঢকঢক করে গিলে ফেললেই জাহাজ ঝাঁঝরা। বামুন—ভোজনের নেমতন্নে গিয়ে সেবার সোনারগাঁয়ে দু—বালতি মাছের মুড়ো—দিয়ে রাঁধা ভাজা সোনারমুগের ডাল খেয়েছিলেন, আরেকবার সদিপিসির শ্রাদ্ধপ্রাশনে দেড়খানা পাঁঠার মাংস, জমিদারমশাইয়ের সেজোছেলের বিয়েতে আশি টুকরো পোনা মাছ, দু—হাঁড়ি দই আর দু—সের রসগোল্লা। গোবিন্দপুরের লোকেরা এমনিতেই খাইয়ে। তারা যেখানে যায়, সেখানকার সব কিছু খেয়ে প্রায় দুর্ভিক্ষ বাধিয়ে দিয়ে আসে। সেই গোবিন্দপুরের ভোজনপ্রিয় লোকদের চক্কোত্তিমশাই হলেন চ্যাম্পিয়ন। তবে এসব খাওয়াদাওয়ার পিছনে আছে পুরোনো ইঁদারার স্বাস্থ্যকর জল। খেয়ে এসে জল খাও। পেট খিদেয় ডাকাডাকি করতে থাকবে।

সেই ইঁদারা নিয়েই বখেরা। চক্কোত্তিমশাই হত্তুকি গিলে ফেলে ভারি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। হত্তুকি এমনিতে বড়ো ভালো জিনিস। কিন্তু আস্ত হত্তুকি পেটে গেলে হজম হবে কি না সেইটেই প্রশ্ন। পুরোনো ইঁদারার জল পাওয়া গেলে হত্তুকি নিয়ে চিন্তা করার প্রশ্নই ছিল না।

চক্কোত্তিমশাই করজোড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রাজামশাই, আমাদের গোবিন্দপুর গাঁয়ের পুরোনো ইঁদারার জল বড়ো বিখ্যাত। এতকাল সেই জল খেয়ে কোনো রোগ—বালাই আমরা গাঁয়ে ঢুকতে দিইনি। কিন্তু বড়োই দুঃখের কথা, ইঁদারার জল আর আমরা তুলতে পারছি না।'

রায়মশাই একটু শ্লেষের হাসি হেসে বললেন, 'হবে না? পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমার ছেলের বিয়েতে যে বড়ো গোরু দিয়ে আমাকে অপমান করেছিলে?'

চক্কোত্তিমশাই জিভ কেটে বললেন, 'ছি ছি, আপনাকে অপমান রাজামশাই? সেরকম চিন্তা আমাদের মরণকালেও হবে না। তা ছাড়া ব্রাহ্মণকে গো—দান করলে পাপ হয় বলে কোনো শাস্ত্রে নেই। গো—দান মহাপুণ্য কর্ম।'

রায়মশায়ের নতুন সভাপণ্ডিত কেশব ভট্টাচার্য মাথা নেড়ে বললেন, 'কূট প্রশ্ন। কিন্তু কথাটা আপাতগ্রাহ্য।'

রায়মশাই একটু নরম হয়ে বললেন, 'ইঁদারার কথা আমিও শুনেছি। সেবার গোবিন্দপুর থেকে পুরোনো ইঁদারার জল আনিয়ে আমাকে খাওয়ানো হয়। খুব উপকার পেয়েছিলাম। তা সে ইঁদারা কি শুকিয়ে গেছে নাকি?'

চক্কোত্তিমশাই ট্যাঁক থেকে আর একটা হত্তুকি বের করে লুকিয়ে মুখে ফেলে বললেন, 'আজ্ঞে না। তাতে এখনও কাকচক্ষু জল টলমল করছে। কিন্তু সে জল হাতের কাছে থেকেও আমাদের নাগালের বাইরে। দড়ি বেঁধে ঘটি বালতি যা—ই নামানো যায়, তা আর ওঠানো যায় না। দড়ি কে যেন কেটে নেয়, ছিঁড়ে দেয়। লোহার শিকলও কেটে দিয়েছে।'

রক্তচক্ষে রায়মশাই হুংকার দিলেন, 'কার এত সাহস?'

এবার হুংকার শুনে গোবিন্দপুরের লোকেরা খুশি হল। নড়েচড়ে বসল। মাথার ওপর জমিদারবাহাদুর থাকতে ইঁদারার জল বেহাত হবে, এ কেমন কথা।

ঠাকুরমশাই বললেন, 'আজ্ঞে মানুষের কাজ নয়। এত বুকের পাটা কারও নাই। গোবিন্দপুরের লেঠেলদের কে না চেনে। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো মাথার ওপর আপনিও রয়েছেন। লেঠেলদের এলেমে না কুলোলে আপনি শাসন করবেন; কিন্তু এ কাজ যাঁরা করছেন তাঁরা মানুষ নন। অশরীরী।'

গোদের ওপর বিষফোঁড়ার উপমা শুনে একটু রেগে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অশরীরীর কথা শুনেই মুহূর্তের মধ্যে কানে হাত চাপা দিয়ে ডুকরে উঠলেন রায়মশাই, 'ওরে বলিস না, বলিস না।'

সবাই তাজ্জব।

নায়েবমশাই রোষকষায়িত লোচনে গোবিন্দপুরের প্রজাদের দিকে চেয়ে বললেন, 'মুখ সামলে কথা বলো।'

চক্কোত্তিমশাই ভয়ের চোটে দ্বিতীয় হত্তুকিটাও গিলে ফেলতে ফেলতে অতি কষ্টে সামাল দিলেন।

রায়মশাইয়ের বড়ো ভূতের ভয়। পারতপক্ষে তিনি ও নাম মুখেও আনেন না। শোনেনও না। কিন্তু কৌতূহলেরও তো শেষ নেই। খানিকক্ষণ কান হাতে চেপে রেখে খুব আস্তে একটুখানি চাপা খুলে বললেন, 'কী যেন বলছিলি?'

চক্কোত্তিমশাই উৎসাহ পেয়ে বলেন, 'আজ্ঞে সে এক অশরীরী কাণ্ড। ভূ—'

'বলিস না! খবরদার বলছি, বলবি না!' রায়বাবু আবার কানে হাতচাপা দেন।

চক্কোত্তিমশাই বোকার মতো চারদিকে চান। সবাই এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। নায়েবমশাই 'চোপ' বলে একটা প্রচণ্ড ধমক মারেন।

একটু বাদে রায়বাবু আমার কান থেকে হাতটা একটু সরিয়ে বলেন, 'ইঁদারার জলে কী যেন?'

চক্কোত্তিমশাই এবার একটু ভয়ে ভয়েই বলেন, 'আজ্ঞে সে এক সাঙ্ঘাতিক ভূতুড়ে ব্যাপার!'

'চুপ কর, চুপ কর! রাম রাম রাম রাম!'

বলে আবার রায়বাবু কানে হাত। খানিক পরে আবার তিনি বড়ো বড়ো চোখ করে চেয়ে বলেন, 'রেখে ঢেকে বল।'

'আজ্ঞে বালতি—ঘটির সব দড়ি তেনারা কেটে নেন। শেকল পর্যন্ত ছেঁড়েন, তা ছাড়া ইঁদারার মধ্যে হাওয়া বয় না, বাতাস দেয় না, তবু তালগাছের মতো ঢেউ দেয়, জল হিলিবিলি করে ফাঁপে।'

'বাবা রে!' বলে রায়বাবু চোখ বুজে ফেলেন।

ক্রমে—ক্রমে অবশ্য সবটাই রায়বাবু শুনলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'দিনটাই মাটি করলি তোরা। নায়েবমশাই, আজ রাতে আমার শোবার ঘরে চারজন দারোয়ান মোতায়েন রাখবেন।'

'যে আজ্ঞে।'

গোবিন্দপুরের প্রজারা হাতজোড় করে বলল, 'হুজুর আপনার ব্যবস্থা তো দারোয়ান দিয়ে করালেন, এবার আমাদের ইঁদারার একটা বিলিব্যবস্থা করুন।'

'ইঁদারা বুজিয়ে ফ্যাল গে। ও ইঁদারা আর রাখা ঠিক নয়। দরকার হলে আমি ইঁদারা বোজানোর জন্য গো—গাড়ি করে ভালো মাটি পাঠিয়ে দেব'খন।'

তখন শুধু গোবিন্দপুরের প্রজারাই নয়, কাছারিঘরের সব প্রজাই হাঁ—হাঁ করে উঠে বলে, 'তা হয় না হুজুর, সেই ইঁদারার জল আমাদের কাছে ধন্বন্তরী। তা ছাড়া জল তো নষ্টও হয়নি, পোকাও লাগেনি, কয়েকটা ভূত—'

রায়বাবু হুংকার দিলেন, 'চুপ! ও নাম মুখে আনবি তো মাটিতে পুঁতে ফেলব।'

সবাই চুপ মেরে যায়। রায়বাবু ব্যাজার মুখে কিছুক্ষণ ভেবে ভট্টাচার্যমশাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'এ তো লেঠেলদের কর্ম নয়। একবার যাবেন নাকি সেখানে?'

রায়মশাইয়ের আগের সভাপণ্ডিত মুকুন্দ শর্মা একশো বছর পার করে এখনও বেঁচে আছেন। তবে একটু অথর্ব হয়ে পড়েছেন। ভারি ভুলো মন আর দিনরাত খাই—খাই। তাঁকে দিয়ে কাজ হয় না। তাই নতুন সভাপণ্ডিত রাখা হয়েছে কেশব ভট্টাচার্যকে।

কেশব এই অঞ্চলের লোক নন। কাশী থেকে রায়মশাই তাঁকে আনিয়েছেন। তাঁর ক্ষমতা বা পাণ্ডিত্য কতদূর তার পরীক্ষা এখনও হয়নি। তবে লোকটিকে দেখলে শ্রদ্ধা হয়। চেহারাখানা বিশাল তো বটেই গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল— তা সেও বেশি কথা নয়। তবে মুখের দিকে চাইলে বোঝা যায় চেহারার চেয়েও বেশি কিছু এঁর আছে। সেটা হল চরিত্র।

জমিদারের কথা শুনে কেশব একটু হাসলেন।

পরদিন সকালেই গো—গাড়ি চেপে কেশব রওনা হয়ে গেলেন গোবিন্দপুর। পিছনে পায়ে হেঁটে গোবিন্দপুরের শ দুই লোক।

দুপুর পেরিয়ে গাঁয়ে ঢুকে কেশব মোড়লের বাড়িতে একটু বিশ্রাম করে ইঁদারার দিকে রওনা হলেন। সঙ্গে গোবিন্দপুর আর আশপাশের গাঁয়ের হাজার হাজার লোক।

ভারি সুন্দর একটা জায়গায় ইঁদারাটি খোঁড়া হয়েছিল। চারদিকে কলকে ফুল আর ঝুমকো জবার কুঞ্জবন, একটা বিশাল পিপুল গাছ ছায়া দিচ্ছে। ইঁদারার চারধারে বড়ো বড়ো ঘাসের বন। পাখি ডাকছে, প্রজাপতি উড়ছে।

কেশব আস্তে আস্তে ইঁদারার ধারে এসে দাঁড়ালেন। মুখখানা গম্ভীর। সামান্য ঝুঁকে জলের দিকে চাইলেন। সত্যিই কাকচক্ষু জল। টলটল করছে। কেশব আস্তে করে বললেন, 'কে আছিস! উঠে আয়, নইলে থুথু ফেলব।'

এই কথায় কী হল কে জানে। ইঁদারার মধ্যে হঠাৎ হুলুস্থুলু পড়ে গেল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ দিয়ে জল ইঁদারার কানা পর্যন্ত উঠে আসতে লাগল। সেই সঙ্গে বোঁ—বোঁ বাতাসের শব্দ।

লোকজন এই কাণ্ড দেখে দৌড়ে পালাচ্ছে। শুধু চক্কোত্তিমশাই ভয়ে কাঁপতে—কাঁপতেও একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন।

'থুথু ফেলবেন না, থুথু ফেলবেন না' বলতে বলতে ইঁদারা থেকে শয়ে শয়ে ভূত বেরোতে থাকে। চেহারা দেখে ভড়কাবার কিছু নেই। রোগা লিকলিকে কালো—কালো সব চেহারা, তাও রক্তমাংসের নয়— ধোঁয়াটে জিনিস দিয়ে তৈরি। সবকটার গা ভিজে সপসপ করছে, চুল বেয়ে জল পড়ছে।

কেশব তাদের দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ঢুকেছিলি কেন এখানে?'

'আজ্ঞে ভূতের সংখ্যা বড্ডই কমে যাচ্ছে যে! এই ইঁদারার জল খেয়ে এ তল্লাটের লোকের রোগবালাই নেই। একশো—দেড়শো বছর হেসেখেলে বাঁচে! না মলে ভূত হয় কেমন করে? তাই ভাবলুম, ইঁদারাটা দখল করে থাকি!'

বলে ভূতেরা মাথা চুলকোয়।

কেশব বললেন, 'অতি কূট প্রশ্ন। কিন্তু কথাটা আপাতগ্রাহ্য।'

ভূতেরা আশকারা পেয়ে বলে, 'ওই যে চক্কোত্তিমশাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ওঁরই বয়স একশো বিশ বছর। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করুন ওঁকে।'

কেশব অবাক চোখে চক্কোত্তির দিকে তাকিয়ে বলেন, 'বলে কী এরা মশাই? সত্যি নাকি?'

একহাতে ধরা পইতে, অন্য হাতের আঙুলে গায়ত্রী জপ কড়ে ধরে রেখে চক্কোত্তি আমতা—আমতা করে বলেন, 'ঠিক স্মরণ নেই।'

'কূট প্রশ্ন। কিন্তু আপাতগ্রাহ্য।' কেশব বললেন।

ঠিক এই সময়ে চক্কোত্তির মাথায়ও ভারি কূট একটা কথা এল। তিনি ফস করে বললেন, 'ভূতেরা কি মরে?'

কেশব চিন্তিতভাবে বললেন, 'সেটাও কূট প্রশ্ন।'

চক্কোত্তি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কিন্তু আপাতগ্রাহ্য। ভূত যদি না—ই মরে, তবে সেটাও ভালো দেখায় না। স্বয়ং মাইকেল বলে গেছেন, জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?'

ভূতেরা কাঁউমাউ করে বলে উঠল, 'তা সে আমরা কী করব? আমাদের হার্ট ফেল হয় না, ম্যালেরিয়া, ওলাওঠা, সান্নিপাতিক, সন্ন্যাস রোগ হয় না— তাহলে মরব কীসে! দোষটা কী আমাদের?'

চক্কোত্তি সাহসে ভর করে বলেন, 'তাহলে দোষ তো আমাদেরও নয় বাবাসকল।'

কেশব বললেন, 'অতি কূট প্রশ্ন।'

চক্কোত্তি বলে উঠলেন, 'কিন্তু আপাতগ্রাহ্য।'

শ—পাঁচেক ছন্নছাড়া বিদঘুটে ভেজা ভূত চারদিকে দাঁড়িয়ে খুব উৎকণ্ঠার সঙ্গে কেশবের দিকে তাকিয়ে আছে। কী রায় দেন কেশব।

একটা বুড়ো ভূত কেঁদে বলল, 'ঠাকুরমশাই, জলে ভেজানো ভাত যেমন পান্তা ভাত, তেমনি দিনরাত জলের মধ্যে থেকে থেকে আমরা পান্তো্যা ভূত হয়ে গেছি। ভূতের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য এত কষ্ট করলুম, সে—কষ্ট বৃথা যেতে দেবেন না।'

'এও অতি কূট প্রশ্ন।' কেশব বললেন।

চক্কোত্তিমশাই এবার আর 'আপাতগ্রাহ্য' বললেন না। সাহসে ভর করে বললেন, 'তাহলে ভূতেরও মৃত্যুর নিদান থাকা চাই। না যদি হয় তবে আমিও ইঁদারার মধ্যে থুথু ফেলব। আর তারই বা কী দরকার। এক্ষুনি আমি এইসব ভূত বাবাসকলের গায়েই থুথু ফেলছি।'

চক্কোত্তিমশাই বুঝে গেছেন, থুথুকে ভূতদের ভারি ভয়। বলার সঙ্গে সঙ্গে ভূতেরা আঁতকে উঠে দশ হাত পিছিয়ে চেঁচাতে থাকে, 'থুথু ফেলবেন না! থুথু দেবেন না!'

কেশব চক্কোত্তিমশাইকে এক হাতে ঠেকিয়ে রেখে ভূতদের দিকে ফিরে বললেন, 'চক্কোত্তিমশাই যে কূট প্রশ্ন তুলেছেন, তা আপাতগ্রাহ্যও বটে। আবার তোমাদের কথাও ফেলনা নয়। কিন্তু যুক্তি প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে, ভূত কখনো মরে না। সুতরাং ভূত খরচ হয় না, কেবল জমা হয়। অন্যদিকে মানুষ দুশো বছর বাঁচলেও একদিন মরে। সুতরাং মানুষ খরচ হয়। তাই তোমাদের যুক্তি টেকে না।'

ভূতেরা কাঁউমাউ করে বলতে থাকে, 'আজ্ঞে অনেক কষ্ট করেছি!'

কেশব দৃঢ় স্বরে বললেন, 'তা হয় না। ঘটি বাটি যা সব কুয়োর জলে ডুবেছে, সমস্ত তুলে দাও, তারপর ইঁদারা ছাড়ো। নইলে চক্কোত্তিমশাই আর আমি দু—জনে মিলে থু—'

আর বলতে হল না। ঝপাঝপ ভূতেরা ইঁদারায় লাফিয়ে নেমে ঠনাঠন ঘটি—বালতি তুলতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে ঘটি—বালতির পাহাড় জমে গেল ইঁদারার চারপাশে।

পুরোনো ইঁদারায় এরপর ভূতের আস্তানা রইল না। ভেজা ভূতেরা গোবিন্দপুরের মাঠে রোদে পড়ে থেকে থেকে ক—দিন ধরে গায়ের জল শুকিয়ে নিল। শুকিয়ে আরও চিমড়ে মেরে গেল। এত রোগা হয়ে গেল তারা যে, গাঁয়ের ছেলেপুলেরাও আর তাদের দেখে ভয় পেত না।

পুরোনো জিনিস

মদনবাবুর একটা নেশা, পুরোনো জিনিস কেনা। মদনবাবুর পৈতৃক বাড়িটা বিশাল, তাঁর টাকারও অভাব নেই, বিয়ে—টিয়ে করেননি বলে এই একটা বাতিক নিয়ে থাকেন। বয়স খুব বেশিও নয়, ত্রিশ—পঁয়ত্রিশের মধ্যেই। তিনি ছাড়া বাড়িতে একটি পুরোনো রাঁধুনি বামুন আর বুড়ো চাকর আছে। মদনবাবু দিব্যি আছেন। ঝুট—ঝামেলা নেই, কোথাও পুরোনো জিনিস, কিম্ভূত জিনিস কিনে ঘরে ডাঁই করেছেন তার হিসেব নেই। তবে জিনিসগুলো ঝাড়পোঁচ করে সযত্নে রক্ষা করেন তিনি। ইঁদুর আরশোলা উইপোকার বাসা হতে দেন না। ট্যাঁক ঘড়ি, দেয়াল ঘড়ি, আলমারি, খাট—পালং, ডেস্ক, টেবিল, চেয়ার, দোয়াতদানি, নস্যির ডিবে, কলম, ঝাড়লণ্ঠন, বাসনপত্র সবই তাঁর সংগ্রহে আছে।

খবরের কাগজে তিনি সবচেয়ে মন দিয়ে পড়েন পুরোনো জিনিস বিক্রির বিজ্ঞাপন, রোজ অবশ্য ওরকম বিজ্ঞাপন থাকে না। কিন্তু রবিবারের কাগজে একটি—দুটি থাকেই।

আজ রবিবার সকালে মদনবাবু খবরের কাগজ পড়তে পড়তে এক জায়গায় এসে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। ম্যাকফারলন সাহেবের দেড়শো বছরের পুরোনো বাড়ির সব জিনিস বিক্রি করা হবে।

ব্রড স্ট্রিটে ম্যাকফারলন সাহেবের যে বাড়িটা আজও টিকে আছে। তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। পড়ো—পড়ো অবস্থা। কর্পোরেশন থেকে বহুবার বাড়ি ভাঙার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বুড়ো ম্যাকফারলনের আর সরবার জায়গা ছিল না বলে বাড়িটা ভাঙা হয়নি। ওই বাড়িতে ম্যাকফারলনদের তিন পুরুষের বাস। জন ম্যাকফারলনের সঙ্গে মদনবাবুর একটু চেনা ছিল, কারণ জন ম্যাকফারলনেরও পুরোনো জিনিস কেনার বাতিক ছিল। মাত্র মাস পাঁচেক আগে সাহেব মারা যান। তখনই মদনবাবু তাঁর জিনিসপত্র কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেননি। এক অবাঙালি ব্যবসায়ীর কাছে আগে থেকেই বাড়ি এবং জিনিসপত্র বাঁধা দেওয়া ছিল। সেই ব্যবসায়ী মদনবাবুকে সাফ বলে দিয়েছিল, 'উটকো ক্রেতাকে জিনিস বিক্রি করা হবে না। নিলামে চড়ানো হবে।'

মদনবাবু তাঁর বুড়ো চাকরকে ডেকে বললেন, 'ওরে ভজা, আমি চললুম। দোতলার হলঘরটার উত্তর দিক থেকে পিয়ানোটাকে সরিয়ে কোণে ঠেলে দিস, আজ কিছু নতুন জিনিস আসবে।'

ভজা মাথা নেড়ে বলে, 'নতুন নয় পুরোনো।'

'ওই হল। আর রাঁধুনিকে বলিস খাবার ঢাকা দিয়ে রাখে যেন। ফিরতে দেরি হতে পারে।'

মদনবাবু ট্যাক্সি হাঁকিয়ে যখন ম্যাকফারলনের বাড়িতে পৌঁছোলেন তখন সেখানে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়ে গেছে। মদনবাবু বেশিরভাগ লোককেই চেনেন। এরা সকলেই পুরোনো জিনিসের সমঝদার এবং খদ্দের। সকলেরই বিলক্ষণ টাকা আছে। মদনবাবু বুঝলেন আজ তাঁর কপালে কষ্ট আছে। আদৌ কোনো জিনিস হাত দেওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

নিলামের আগে খদ্দেররা এঘর—ওঘর ঘুরে ম্যাকফারলনের বিপুল সংগ্রহরাশি দেখছেন। আসবাবপত্র থেকে শুরু করে ছোটোখাটো জিনিসের এক খনি বিশেষ। কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরেন তা ভাবতে গিয়ে মদনবাবু হিমসিম খেতে লাগলেন।

বেলা বারোটায় নিলাম শুরু হল। একটা করে জিনিস নিলামে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে হাঁকডাক পড়ে যায়। মদনবাবুর চোখের সামনে একটা মেহগনির পালঙ্ক দশ হাজার টাকায় বিকিয়ে গেল। একটা কাট গ্লাসের পানপাত্রের সেট বিকিয়ে গেল বারো হাজার টাকায়। এ ছাড়া মুক্তোমালার দাম উঠল চল্লিশ হাজার।

মদনবাবু বেলা চারটে অবধি একটা জিনিসও ধরতে পারলেন না। মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। দর আজ যেন বড্ড বেশি উঠে যাচ্ছে।

একেবারে শেষদিকে একটা পুরোনো কাঠের আলমারি নিলামে উঠল, বেশ বড়োসড়ো এবং সাদামাটা। আলমারিটা অন্তত একটা স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে কবজা করার জন্য মদনবাবু প্রথমেই দর হাঁকলেন পাঁচ হাজার।

অমনি পাশ থেকে কে যেন ডেকে দিল, 'কুড়ি হাজার।'

মদনবাবু অবাক হয়ে গেলেন। একটা কাঠের আলমারির দর এত ওঠার কথাই না। কেউ ফাঁকা আওয়াজ ছেড়ে দর বাড়াচ্ছে নাকি! নিলামে এরকম প্রায়ই হয়।

তবে মদনবাবুর মর্যাদাতেও লাগছিল খালি হাতে ফিরে যাওয়াটা। একটা কিছু না নিয়ে যেতে পারলে নিজের কাছেই যেন নিজে মুখ দেখাতে পারবে না, মদনবাবু তাই মরিয়া হয়ে ডাকলেন, 'একুশ হাজার।'

আশ্চর্য এই যে, দর আর উঠল না।

একুশ হাজার টাকায় আলমারিটা কিনে মহানন্দে বাড়ি ফিরলেন মদনবাবু। যদিও মনে মনে বুঝলেন, দরটা বড্ড বেশি হয়ে গেল।

পরদিন সকালে আলমারিটা কুলিরা ধরাধরি করে পৌঁছে দিয়ে গেল। দোতলার হলঘরের উত্তরদিকের জানালার পাশেই সেটা রাখা হল। বেশ ভারি জিনিস। দশটা কুলি গলদঘর্ম হয়ে গেছে এটাকে তুলতে।

নিলামওয়ালার দেওয়া চাবি দিয়ে আলমারিটা খুলে ফেললেন মদনবাবু।

নীচে আর ওপরে কয়েকটা ড্রয়ার। মাঝখানে ওয়ার্ডরোভ। মদনবাবু অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখলেন জিনিসটা, বর্মা—সেগুন কাঠের তৈরি ভালো জিনিস। কিন্তু একুশ হাজার টাকা দরটা বেজায় বেশি হয়ে গেছে। তার আর কী করা! এ নেশা যার আছে তাকে মাঝে মাঝে ঠকতেই হয়।

একুশ হাজার টাকার কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মদনবাবু। গভীর রাতে ম্যাকফারলন সাহেবকে স্বপ্নে দেখলেন। বুড়ো তাঁকে বলছে, 'তুমি মোটেই ঠকোনি হে, বরং জিতেছ।'

মদনবাবু ম্লান হেসে বললেন, না সাহেব, নিছক কাঠের আলমারির জন্য দর হাঁকাটা আমার ঠিক হয়নি।

ম্যাকফারলন শুধু ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল, 'না—না, আমার তা মনে হয় না!'

'আমার তা মনে হয় না...'

মদনবাবু মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে একবার জল খান রোজই। আজ ঘুম ভাঙল। পাশের টেবিল থেকে জলের গেলাসটা নিতে গিয়ে হঠাৎ শুনলেন, পাশের হলঘর থেকে যেন একটু খুটুর—খুটুর শব্দ আসছে। ওই ঘরে তাঁর সব সাধের পুরোনো জিনিস। মদনবাবু তাড়াতাড়ি উঠে টর্চ নিয়ে পাশের ঘরে হানা দিলেন।

টর্চটা জ্বালাতে যাবেন এমন সময় কে যেন বলে উঠল, 'দয়া করে বাতি জ্বালাবে না, আমার অসুবিধে হবে।'

মদনবাবু ভারি রেগে গেলেন, টর্চের সুইচ টিপে বললেন, 'আচ্ছা নির্লজ্জ লোক তো! চুরি করতে ঢুকে আবার চোখ রাঙানো হচ্ছে! কে হে তুমি?'

চোরটা যে কে বা কেমন লোক তা বোঝা গেল না। কারণ টর্চটা জ্বলল না। মদনবাবু টর্চটা বিস্তর ঝাঁকালেন, নাড়লেন, উলটে—পালটে সুইচ টিপলেন, বাতি জ্বলল না।

'এ তো মহা ফ্যাসাদ দেখছি!'

কে যেন মোলায়েম স্বরে বলল, 'অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন?'

মদনবাবু চোরকে ধরার জন্য আস্তিন গোটাতে গিয়ে টের পেলেন যে, তাঁর গায়ে জামা নেই, আজ গরম বলে খালি গায়ে শুয়েছিলেন, হেঁড়ে গলায় একটা হাঁক মারলেন, 'শিগগির বেরো বলছি, নইলে গুলি করব। আমার কিন্তু রিভলভার আছে।'

'নেই।'

'কে বলল নেই?'

'জানি কি না।'

'কিন্তু লাঠি আছে।'

'খুঁজে পাবেন না।'

'কে বলল খুঁজে পাব না?'

'অন্ধকারে লাঠি খোঁজা কী সোজা?'

আমার গায়ে কিন্তু সাংঘাতিক জোর, এক ঘুঁষিতে নারকেল ফাটাতে পারি।

'কোনোদিন ফাটাননি।'

'কে বলল ফাটাইনি।'

'জানি কিনা। আপনার গায়ে তেমন জোরই নেই।'

'আমি লোক ডাকি, দাঁড়াও।'

'কেউ আসবে না। কিন্তু খামোকা কেন চেঁচাচ্ছেন?'

'চেঁচাব না? আমার এত সাধের সব জিনিস এ—ঘরে, আর এই ঘরেই কিনা চোর!'

'চোর বটে, কিন্তু এলেবেলে চোর নই মশাই।'

'তার মানে?'

'কাল সকালে বুঝবেন। এখন যান গিয়ে ঘুমোন। আমাকে ডিস্টার্ব করবেন না।'

মদনবাবু ফের ঘাবড়ে গিয়ে ফিরে গেলেন ঘরে। দুরু—দুরু বুকে বসে থেকে পাশের ঘরের নানা বিচিত্র শব্দ শুনতে লাগলেন। তাঁর সাধের সব জিনিস বুঝি এবারে যায়!!

দিনের আলো ফুটতেই মদনবাবু গিয়ে হলঘরে ঢুকে যা দেখলেন তাতে ভারি অবাক হয়ে গেলেন। ম্যাকফারলনের সেই কাট গ্লাসের পানপাত্রের সেট আর একটা গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক হলঘরে দিব্যি সাজিয়ে রাখা। এ দুটো জিনিস কিনেছিল দু—জন আলাদা খদ্দের। খুশি হবেন কী দুঃখিত হবেন তা বুঝতে পারলেন না মদনবাবু। কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তে শেষে খুশি—খুশিই লাগছিল তাঁর।

আবার রাত হল। মদনবাবু খেয়েদেয়ে শয্যা নিলেন। তবে ঘুম হল না। এপাশ—ওপাশ করতে করতে একটু তন্দ্রা মতো এল। হঠাৎ হলঘরে আগের রাতের মতো শব্দ শুনে তড়াক করে উঠে পড়লেন। হলঘরে গিয়ে টর্চটা জ্বালাতে চেষ্টা করলেন।

'কে?'

'তা দিয়ে আপনার কী দরকার? যান না গিয়ে শুয়ে থাকুন। আমাদের কাজ করতে দিন।'

মদনবাবু একটু কাঁপা গলায় বললেন, 'তোমরা কারা বাবারা?'

'সে কথা শুনলে আপনি ভয় পাবেন।'

'ইয়ে তা আমি একটু ভীতু বটে। কিন্তু বাবারা, এসব কী হচ্ছে, একটু জানতে পারি না।'

'খারাপ তো কিছু হয়নি মশাই। আপনার তো লাভই হচ্ছে।'

'তা হচ্ছে, তবে কিনা চুরির দায়ে না পড়ি। তোমরা কী চোর?'

লোকটা এবার রেগে গিয়ে বলল, 'কাল থেকে চোর—চোর করে গলা শুকোচ্ছেন কেন? আমরা ফালতু চোর নই।'

'তবে?'

'আমরা ম্যাকফারলন সাহেবের সব চেলা—চামুণ্ডা। আমি হলুম গে সর্দার, যাকে আপনি কিনেছেন একুশ হাজার টাকায়।'

'আলমারি?'

'আজ্ঞে। আমরা সব ঠিক করেই রেখেছিলুম, যে খুশি আমাদের কিনুক না কেন আমরা শেষ অবধি সবাই মিলেমিশে থাকব, তাই—'

'তাই কি?'

'তাই সবাই জোট বাঁধছি, তাতে আখেরে আপনারই লাভ।'

মদনবাবু বেশ খুশিই হলেন। তবু মুখে একটু দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে বললেন, 'কিন্তু বাবারা, দেখো যেন চুরির দায়ে না পড়ি।'

'মেলা ফ্যাচ—ফ্যাচ না করে, যান না নাকে তেল দিয়ে শুয়ে থাকুন গে। কাজ করতে দিন।'

মদনবাবু তাই করলেন। শুয়ে খুব ফিচিক—ফিচিক হাসতে লাগলেন, হলঘরটা ভরে যাবে, দোতলা—তিনতলায় যা ফাঁকা আছে তাও আর ফাঁকা থাকবে না। এবার চারতলাটা না তুললেই নয়।

কৃপণ

কদম্ববাবু মানুষটা যতটা না গরিব তার চেয়েও ঢের বেশি কৃপণ। তিনি চণ্ডীপাঠ করেন কিনা কে জানে, তবে জুতো সেলাই যে করেন তা সবাই জানে। আর করেন মুচির পয়সা বাঁচাতে। তবে আরও একটা কারণ আছে। একবার এক মুচি তাঁর জুতো সেলাই করতে নারাজ হয়ে বলেছিল, এটা তো জুতো নয়, জুতোর ভূত। ফেলে দিন গে। বাস্তবিকই জুতো জোড়া এত ছেঁড়া আর তাপ্পি—মারা যে সেলাই করার আর জায়গাও ছিল না। কিন্তু কদম্ববাবু দমলেন না। একটা গুণছুঁচ আর খানিকটা সুতো জোগাড় করে নিজেই লেগে গেলেন সেলাই করতে।

জুতো সেলাই থেকেই তাঁর ঝোঁক গেল অন্যান্য দিকে। জুতো যদি পারা যায় তাহলে ছাতাই বা পারা যাবে না কেন? সুতরাং ছেঁড়া ভাঙা ছাতাটাও নিজেই সারাতে বসে গেলেন। এরপর ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ, ছুতোরের কাজ, ছুরি—কাঁচি ধার দেওয়া, শিল কাটানো, ফুটো কলসি ঝালাই করা, ছোটোখাটো দর্জির কাজ সবই নিজে করতে লাগলেন। এর ফলে যে উনি বাড়ির লোকের কাছে খুব বাহবা পান তা মোটেই নয়। বরং তাঁর বউ আর ছেলেমেয়েরা তাঁর এই কৃপণতায় খুবই লজ্জায় লজ্জায় থাকে। বাইরের লোকের কাছে তাদের মুখ দেখানো ভার হয়।

কিন্তু কদম্ববাবু নির্বিকার। পয়সা বাঁচানোর যতরকম পন্থা আছে সবই তাঁর মাথায় খেলে যায়। তাঁর বাড়িতে ঝি—চাকর নেই। জমাদার আসে না। নর্দমা পরিষ্কার থেকে বাসন মাজা সবই কদম্ববাবু, তাঁর বউ আর ছেলেমেয়েরা করে নেয়।

ছোটোছেলে বায়না ধরল, ঘুড়ি—লাটাই কিনে দিতে হবে। কদম্ববাবু একটুও না ঘাবড়ে বসে গেলেন ঘুড়ি বানাতে। পুরোনো খবরের কাগজ দিয়ে ঘুড়ি আর কৌটো ছ্যাঁদা করে তার মধ্যে একটা ডান্ডা গলিয়ে লাটাই হল। ঘুড়িটা উড়ল না বটে, কিন্তু কদম্ববাবুর পয়সা বেঁচে গেল।

এহেন কদম্ববাবু একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরছেন। চার মাইল রাস্তা তিনি হেঁটেই যাতায়াত করেন। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মাঝ রাস্তায় ঝেঁপে বৃষ্টি এল। সস্তা ফুটো ছাতায় জল আটকাল না। কদম্ববাবু ভিজে ভূত হয়ে যাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি একটা পুরোনো বাড়ির রক—এ উঠে ঝুল—বারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ছাঁট থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

হঠাৎ পিছনে প্রকাণ্ড দরজাটা খুলে গেল। একজন বুড়ো মতো লোক মুখ বাড়িয়ে একগাল হেসে বলল, এই যে শ্যামবাবু! এসে গেছেন তাহলে? আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন।

কদম্ববাবু তটস্থ হয়ে বললেন, আমি তো শ্যামবাবু নই।

না হলেই বা শুনছে কে? কর্তাবাবু দাবার ছক সাজিয়ে বসে আছেন যে! দেরি হলে কুরুক্ষেত্তর করবেন। এই কী রঙ্গ—রসিকতার সময়? আসুন, আসুন।

কদম্ববাবু সভয়ে বললেন, আমি তো দাবা খেলতে জানি না।

লোকটা আর সহ্য করতে পারল না। কদম্ববাবুর হাতটা ধরে দরজার মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, আচ্ছা লোক যা হোক। আপনি রসিক লোক তা আমরা সবাই জানি। তা বলে সবসময়ে কী রসিকতা করতে হয়?

ভিতরে ঢুকে কদম্ববাবুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল। এইসব পুরোনো বনেদি বাড়িতে তিনি কখনো ঢোকেননি। যেদিকে তাকান চোখ যেন ঝলসে যায়।

মার্বেল পাথরে বাঁধানো মেঝে থেকে শুরু করে ঝাড়বাতি অবধি সবই টাকার গন্ধ ছড়াচ্ছে।

তিনি যে শ্যামবাবু নন, তাঁকে যে ভুল লোক ভেবে এ বাড়িতে ঢোকানো হয়েছে এ কথাটা ভালো করে জোর দিয়ে বলার মতো অবস্থাও কদম্ববাবুর আর রইল না। তিনি চারদিকে চেয়ে মনে মনে হিসেব করতে লাগলেন, এই মার্বেল পাথরের কত দাম, কত দাম ওই দেয়ালগিরির...

ভেজা ছাতা থেকে জল ঝরে মেঝে ভিজে যাচ্ছিল। লোকটা হাত বাড়িয়ে ছাতাটা হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে বলল, এঃ শ্যামবাবু, এই ছেঁড়া—তাপ্পি দেওয়া ছাতা কোথা থেকে পেলেন? আপনার সেই দামি জাপানি ছাতাখানার কী হল?

কদম্ববাবু শুধু হতভম্বের মতো বললেন, জাপানি ছাতা?

লোকটা হঠাৎ তাঁর পেটে একটা চিমটি কেটে বলল, আপনার মতো শৌখিন মানুষ ক—টা আছে বলুন।

ছেঁড়া জুতোয় জল ঢুকে সপসপ করছিল। কদম্ববাবু জুতো জোড়া সন্তর্পণে ছেড়ে রাখলেন একধারে।

কিন্তু লোকটার চোখ এড়ানো গেল না। জুতো জোড়া দেখতে পেয়ে লোকটা আঁতকে উঠে বলল, সেই সোনালি সুতোর কাজ—করা নাগরা জোড়া কোথায় গেল আপনার? তার বদলে এ কী?

কদম্ববাবু কৃপণ বটে, কিন্তু তিনি নিজেও জানেন যে, তিনি কৃপণ। সাধারণ কৃপণেরা টেরই পায় না যে, তারা কৃপণ। তারা ভাবে যে তারা যা করছে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কদম্ববাবু তাদের মতো নন। তাই লোকটার কথায় ভারি লজ্জা পেলেন তিনি। এমনকী তিনি যে শ্যামবাবু নন এ কথাটাও হঠাৎ ভুলে গিয়ে তিনি বলে ফেললেন, বর্ষাকাল বলে নাগরা জোড়া পরিনি।

লোকটা একটু তাচ্ছিল্যের ভাব করে বলল, যার দেড়শো জোড়া জুতো সে আবার সামান্য নাগরার মায়া করবে এটা কী ভাবা যায়? শ্যামবাবু ছেঁড়া জুতো পরে বাবুর বাড়ি আসছেন, এ যে কলির শেষ হয়ে এল।

কদম্ববাবু এ কথা শুনে সভয়ে আড়চোখে নিজের পোশাকটাও দেখে নিলেন। পরনে মিলের মোটা ধুতি, গায়ে একটা সস্তা ছিটের শার্ট। শ্যামবাবু নিশ্চয়ই এই পোশাক পরেন না।

যেন তাঁর মনের কথাটি টের পেয়েই লোকটা হঠাৎ বলে উঠল, নাঃ, আজ বোধহয় আপনি ছদ্মবেশ ধারণ করেই এসেছেন শ্যামবাবু। তা ভালো। বড়োলোকদেরও কী আর মাঝে মাঝে গরিব সাজতে ইচ্ছে যায় না! নইলে শ্যামবাবুর গায়ে তালি—মারা জামা, পরনে হেঁটো ধুতি হয় কী করে!

কদম্ববাবু বিগলিত হয়ে হাসলেন। বললেন, ঠিক ধরেছেন বটে।

হলঘরের পর দরদালান। আহা, দরদালানেরও কী শ্রী! দু—ধারে পাথরের সব মূর্তি, বিশাল বিশাল অয়েল পেন্টিং, পায়ের নীচে নরম কার্পেট।

এসব জিনিস চর্মচক্ষে বড়ো একটা দেখেননি কদম্ববাবু। তবে শুনেছেন। টাকার কতখানি অপচয় যে এতে হয়েছে তা ভেবে তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল।

দু—ধারে সারি সারি ঘর। দরজায় ব্রোকেড বা ওই জাতীয় জিনিসের পর্দা ঝুলছে। দেয়ালগিরি আর ঝাড়লণ্ঠনের ছড়াছড়ি। এক—একটা ঝাড়ের দাম যদি হাজার টাকা করেও হয় কমপক্ষে...

নাঃ, কদম্ববাবু আর ভাবতে পারলেন না।

লোকটা দরদালানের শেষে একটা চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বলল, কর্তাবাবুও আজ আপনাকে দেখে মজা পাবেন। যা একখানা ছদ্মবেশ লাগিয়ে এসেছেন আজ!

কদম্ববাবু হেঃ হেঃ করে অপ্রতিভ হাসি হাসলেন।

সিঁড়ি যে এরকম বাহারি হয় তা কদম্ববাবুর সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। আগাগোড়া পাথরে বাঁধানো কার্পেটে মোড়া এ সিঁড়িতে পা রাখতেও তাঁর লজ্জা করছিল।

দোতলায় উঠে কদম্ববাবু একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। রাজদরবারের মতো বিশাল ঘর রুপোয় একেবারে রূপের হাট খুলে বসে আছে। যেদিকে তাকান সেদিকেই রুপো। রুপোর ফুলদানি, রুপোর ফুলের টব, রুপোর টেবিল, রুপোর চেয়ার, দেয়ালে রুপোর বাঁধানো বড়ো বড়ো ফোটো।

কদম্ববাবু চোখ পিটপিট করতে লাগলেন।

লোকটা একটু ফিচকে হেসে বলল, হল কী শ্যামবাবুর? অ্যাঁ! এ বাড়ি কী আপনার অচেনা? রুপোমহলে দাঁড়িয়ে থাকলেই কী চলবে? কর্তাবাবু যে সোনামহল্লায় আপনার জন্য বসে থেকে থেকে হেদিয়ে পড়লেন! আসুন তাড়াতাড়ি।

সোনামহল্লা! কদম্ববাবুর বেশ ঘাম হতে লাগল শুনে। রুপো মহলেই যে লাখো লাখো টাকা ছড়িয়ে আছে চারধারে।

কিংখাবের একটা পর্দা সরিয়ে লোকটা বলল, যান, ঢুকে পড়ুন।

কদম্ববাবু কাঁপতে কাঁপতে সোনামহল্লায় ঢুকলেন। কিন্তু ঢুকেই যে কেন মূর্ছা গেলেন না সেটাই অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি।

সোনামহল্লার সব কিছুই সোনার। এমনকী পায়ের তলার কার্পেটটায় অবধি সোনার সুতোর কাজ। সোনার পায়াওলা টেবিল, সোনার পাতে মোড়া চেয়ার, সোনার ফুলদানি, সোনার ঝাড়লণ্ঠন। এত সোনা যে পৃথিবীতে আছে তা—ই জানা ছিল না কদম্ববাবুর।

তিনি এমন হাঁ হয়ে গেলেন যে, ঘরের মাঝখানে একটা নীচু সোনার টেবিলের ওপাশে যে গৌরবর্ণ পুরুষটি একটা সোনায় বাঁধানো আরাম—কেদারায় বসেছিলেন তাঁকে নজরেই পড়েনি তাঁর।

হঠাৎ একটা গমগমে গলা কানে এল, এই যে শ্যামকান্ত! এসো।

কদম্ববাবু ভীষণ চমকে উঠলেন।

চমকানোর আরও ছিল। কর্তাবাবুর সামনে যে দাবার ছকটি পাতা রয়েছে সেটা যে শুধু সোনা দিয়ে তৈরি তা—ই নয় প্রত্যেকটা খোপে আবার হিরে, মুক্তো, চুনি আর পান্না বসানো। একধারে সোনার ঘুঁটি, অন্যধারে রুপোর। প্রত্যেকটা ঘুঁটির মাথায় আবার এক কুঁচি করে হিরে বসানো।

বোসো, বোসো হে শ্যামকান্ত। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। মনে আছে তো আজ আমাদের বাজি রেখে খেলা। এই হল আমার বাজি।

এই বলে কর্তাবাবু একটা নীল ভেলভেটে মোড়া বাক্সর ঢাকনা খুলে টেবিলের একপাশে রাখলেন।

কদম্ববাবু দেখলেন, বাক্সের মধ্যে মস্ত একটা মুক্তো। মুক্তো যে এতবড়ো হয় তা জানা ছিল না তাঁর।

তুমি কী বাজি রাখবে শ্যামবাবু?

কদম্ববাবু আমতা আমতা করে বললেন, আমি গরিব মানুষ, কী আর বাজি রাখব বলুন।

কর্তাবাবু ঘর কাঁপিয়ে হাঃ হাঃ অট্টহাসি হেসে বললেন, গরিবই বটে। বছরে যার কুড়ি লাখ টাকা আয় সে আবার কেমন গরিব?

আজ্ঞে আপনার তুলনায় আমি আর কী বলুন!

কর্তাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, সে কথাটা সত্যি শ্যামবাবু। আমার মেলা টাকা। এত টাকা যে আজকাল আমার টাকার ওপর ঘেন্না হয়। খুব ঘেন্না হয়।

টাকার ওপর ঘেন্না! কদম্ববাবুর মুখটা হাঁ হাঁ করে উঠল।

কর্তাবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, আজ সকালে মনটা খুব খারাপ ছিল। কিছুতেই ভালো হচ্ছিল না। কী করলুম জানো? দশ লক্ষ টাকার নোট আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দিলুম।

অ্যাঁ?

শুধু কী তাই? ছাদে উঠে মোহর ছুড়ে ছুড়ে কাক তাড়ালুম। তাতে একটু মনটা ভালো হল। তারপর জুড়িগাড়ি করে হাওয়া খেতে বেরিয়ে এক হাজারটা হিরে আর মুক্তো রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে এলুম।

কদম্ববাবু দাঁতে দাঁত চেপে কোনোরকমে নিজেকে সামাল দিলেন। লোকটা বলে কী?

কর্তাবাবু বললেন, এসো, চাল দাও। তুমি কী বাজি রাখবে বললে না?

কদম্ববাবু মুখটা কাঁচুমাচু করে ভাবতে লাগলেন।

কর্তাবাবু নিজেই বললেন, টাকাপয়সা হিরে জহরত তো আমার দরকার নেই। তুমি বরং তোমার পকেটের ওই কলমটা বাজি ধরো।

কলম! কদম্ববাবু শিউরে উঠলেন। মাত্র আট আনায় ফুটপাথ থেকে কেনা। তবু কদম্ববাবু উপায়ান্তর না পেয়ে কলমটাই রাখলেন মুক্তোর উলটোদিকে।

কিন্তু চাল? দাবার যে কিছুই জানে না কদম্ববাবু।

চোখ বুজে একটা ঘুঁটি এগিয়ে দিলেন কদম্ববাবু।

কর্তাবাবু বললেন, সাবাস!

কদম্ববাবু চোখ মেলে একটা শ্বাস ছাড়লেন। তারপর বুদ্ধি করে কর্তাবাবুর দেখাদেখি কয়েকটা চাল দিয়ে ফেললেন।

হঠাৎ কর্তাবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, এ কী! তুমি যে কিস্তি দিয়ে বসেছ আমাকে। অ্যাঁ! এ কী কাণ্ড! আমি যে মাৎ!

তারপরেই কর্তাবাবু হঠাৎ ঘর কাঁপিয়ে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হাসতে লাগলেন। সে এমন হাসি যে, কদম্ববাবুর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। ভয়ে চোখও বুজে ফেললেন।

যখন চোখ মেললেন তখন কদম্ববাবু হাঁ।

কোথায় সোনার ঘর? কোথায় রুপোর ঘর? কোথায় সেই ঝাড়বাতি আর দেয়ালগিরি? কোথায় আসবাবপত্র? এ যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার ভাঙা সোঁদা একটা পোড়োবাড়ির মধ্যে বসে আছেন তিনি! চারদিকে চুন—বালি খসে ডাঁই হয়ে আছে। চতুর্দিকে মাকড়সার জাল! ইঁদুর দৌড়চ্ছে।

কদম্ববাবু আতঙ্কে একটা চিৎকার দিলেন। তারপর ছুটতে লাগলেন।

সেই বাড়িরই এমন দশা কে বিশ্বাস করবে? মেঝের পাথর সব উঠে গেছে, সিঁড়ি ভেঙে ঝুলে আছে, দরদালানের দেয়াল ভেঙে পড়েছে...

কদম্ববাবু পড়ি কী মরি করে ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে কোনোরকমে বাইরের দরজায় পৌঁছোলেন। দরজাটা অক্ষতই আছে। কদম্ববাবু দরজাটার কড়া ধরে হ্যাঁচকা টান মারতেই সেটি খুলে গেল।

কদম্ববাবু রাস্তায় নেমে ছুটতে লাগলেন। বৃষ্টি পড়ছে, তাঁর ছাতা নেই, পায়ে জুতোও নেই। ভাঙা পোড়োবাড়ির মধ্যে কোথায় পড়ে আছে।

কদম্ববাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর ভাবলেন, সত্যিই তো। টাকা বাঁচিয়ে হবেটা কী? শেষে তো ওই ভূতের বাড়ি!

বুক ফুলিয়ে কদম্ববাবু একটা দোকানে ঢুকে একটা বাহারি ছাতা কিনে ফেললেন। জুতোর দোকানে ঢুকে কিনলেন দামি একজোড়া জুতো।

তারপর আবার ভাবতে লাগলেন। শুধু নিজের জন্য কেনাকাটা করাটা ভালো দেখাচ্ছে না।

তিনি আবার দোকানে ঢুকে গিন্নির জন্য শাড়ি আর ছেলেমেয়েদের জন্য জামাকাপড়ও কিনে ফেললেন।

মনটা বেশ ভালো হয়ে গেল তাঁর।

শারদীয়া ১৩৯৪

কৌটোর ভূত

জয়তিলকবাবু যখনই আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে আসতেন তখনই আমরা, অর্থাৎ ছোটোরা ভারি খুশিয়াল হয়ে উঠতুম।

তখনকার, অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ বছর আগের পূর্ববঙ্গের গাঁ—গঞ্জ ছিল আলাদা রকম, মাঠ—ঘাট, খাল—বিল, বন—জঙ্গল মিলে এক আদিম আরণ্যক পৃথিবী। সাপখোপ জন্তু—জানোয়ার তো ছিলই, ভূতপ্রেতেরও অভাব ছিল না। আর ছিল নির্জনতা।

তবে আমাদের বিশাল যৌথ পরিবারে মেলা লোকজন,মেলা কাচ্চাবাচ্চা। মেয়ের সংখ্যাই অবশ্য বেশি। কারণ বাড়ির পুরুষেরা বেশিরভাগই শহরে চাকরি করত, আসত কালেভদ্রে। বাড়ি সামাল দিত দাদু—টাদু গোছের বয়স্করা। বাবা—কাকা—দাদাদের সঙ্গে বলতে কী আমাদের ভালো পরিচয়ই ছিল না, তাঁরা প্রবাসে থাকার দরুন।

বাচ্চারা মিলে আমরা বেশ হই—হুল্লোড়বাজিতে সময় কাটিয়ে দিতাম। তখন পড়াশুনার চাপ ছিল না। ভয়াবহ কোনো শাসন ছিল না। যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু অভাব ছিল একটা জিনিসের। আমাদের কেউ যথেষ্ট পাত্তা বা মূল্য দিত না।

জয়তিলকবাবু দিতেন, আত্মীয় নন, মাঝেমধ্যে এসে হাজির হতেন। কয়েকদিন থেকে আবার কোথায় যেন উধাও হতেন। কিন্তু যে কয়েকটা দিন থাকতেন বাচ্চাদের গল্পে আর নানারকম মজার খেলায় মাতিয়ে রাখতেন।

মাথায় টাক, গায়ের রং কালো, বেঁটে, আঁটো গড়ন আর পাকা গোঁফ ছিল তাঁর। ধুতি আর ফতুয়া ছিল বারোমেসে পোশাক, শীতে একটা মোটা চাদর। সর্বদাই একটা বড়ো বোঁচকা থাকত সঙ্গে। শুনতাম তাঁর ফলাও কারবার। তিনি নাকি সবকিছু কেনেন এবং বেচেন। যা পান তাই কেনেন, যাকে পান তাকেই বেচেন। কোনো বাছাবাছি নেই।

সেবার মাঘমাসের এক সকালে আমাদের বাড়ি এসে হাজির হলেন। এসেই দাদুকে বললেন, গাঙ্গুলিমশাই, এবার কিছু ভূত কিনে ফেললাম।

দাদু কানে কম শুনতেন, মাথা নেড়ে বললেন, খুব ভালো। এবার বেচে দাও।

জয়তিলক কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন, সেটাই তো সমস্যা। ভূত কেনে কে? খদ্দের দিন না।

—খদ্দর? না বাপু ওসব আমি পরি না, স্বদেশিদের কাছে যাও।

—আহা, খদ্দর নয়, খদ্দের, মানে গ্রাহক।

—গায়ক। না বাপু, গান—বাজনা আমার আসে না।

জয়তিলক অগত্যা ক্ষান্ত দিয়ে আমাদের সঙ্গে এসে জুটলেন। তিনি ভূত কিনেছেন শুনে আমাদের চোখ গোল্লা গোল্লা। ঘিরে ধরে 'ভূত দেখাও, ভূত দেখাও' বলে মহা সোরগোল তুলে ফেললুম।

প্রথমে কিছুতেই দেখাতে চান না। শেষে আমরা ঝুলোঝুলি করে তাঁর গোঁফ আর জামা ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করায় বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, দেখাচ্ছি। কিন্তু সব ঘুমন্ত ভূত, শুকিয়ে রাখা।

সে আবার কী?

আহা, যেমন মাছ শুকিয়ে শুঁটকি হয় বা আম শুকিয়ে আমসি হয় তেমনই আর কী। বহু পুরোনো জিনিস।

জয়তিলক তাঁর বোঁচকা খুলে একটা জংধরা টিনের কৌটো বের করলেন। তারপর খুব সাবধানে ভেতরে উঁকি মেরে দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, বেশি গোলমাল কোরো না, এক এক করে উঁকি মেরে দেখে

নাও। ভূতেরা জেগে গেলেই মুশকিল।

কী দেখলুম তা বলা একটা সমস্যা। মনে হল শুকনো পলতা পাতার মতো চার—পাঁচটা কেলেকুষ্টি জিনিস কৌটোর নীচে পড়ে আছে। কৌটোর ভিতরটা অন্ধকার বলে ভালো বোঝাও গেল না। জয়তিলক টপ করে কৌটোর মুখ এঁটে দিয়ে বললেন, আর না। এসব বিপজ্জনক জিনিস।

বলাবাহুল্য, ভূত দেখে আমরা আদপেই খুশি হইনি। আমরা সিদ্ধান্ত নিলুম যে, ওগুলো মোটেই ভূত নয়। জয়তিলকবাবুকে ভালোমানুষ পেয়ে কেউ ঠকিয়েছে।

জয়তিলকবাবু মাথা নেড়ে বললেন, না হে, ঠকায়নি। চৌধুরী বাড়ির বহু পুরোনো লোক হল গোলোক। সারাজীবন কেবল ভূত নিয়ে কারবার। তার তখন শেষ অবস্থা, মুখে জল দেওয়ার লোক নেই। সেই সময়টায় আমি গিয়ে পড়লাম। সেবাটেবা করলাম খানিক, কিন্তু তার তখন ডাক এসেছে। মরার আগে আমাকে কৌটোটা দিয়ে বলল, তোমাকে কিছু দিই এমন সাধ্য নেই। তবে কয়েকটা পুরোনো ভূত শুকিয়ে রেখেছি। এগুলো নিয়ে যাও, কাজ হতে পারে। ভূতগুলোর দাম হিসেব করলে অনেক। তা তোমার কাছ থেকে দাম নেবোই বা কী করে, আর নিয়ে হবেই বা কী। তুমি বরং আমাকে পাঁচ টাকার রসগোল্লা খাওয়াও। শেষ খাওয়া আমার।

এই বলে জয়তিলকবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।
আমরা তবু বিশ্বাস করছিলুম না দেখে জয়তিলকবাবু বললেন, মরার সময় মানুষ বড়ো একটা মিছে কথা বলে না।
তবু আমাদের বিশ্বাস হল না। কিন্তু সেকথা আর বললুম না তাঁকে।
দুপুরবেলা যখন জয়তিলকবাবু খেয়েদেয়ে ভুঁড়ি ভাসিয়ে ঘুমোচ্ছেন ঠিক সেই সময়ে আমি আর বিশু তাঁর ভূতের কৌটো চুরি করলুম। এক দৌড়ে আমবাগানে পৌঁছে কৌটো খুলে ফেললুম। উপুড় করতেই পাঁচটা শুকনো পাতার মতো জিনিস পড়ল মাটিতে। হাতে নিয়ে দেখলুম, খুব হালকা। এত হালকা যে জিনিসগুলো আছে কী নেই তা বোঝা যায় না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে মনে হল, এগুলো পাতা—টাতা নয়। অনেকটা ঝুলজাতীয় জিনিস, তবে পাক খাওয়ানো, বেশ ঠান্ডাও।
বিশু বলল, ভূত কিনা তা প্রমাণ হবে যদি ওগুলো জেগে ওঠে।
—তা জাগাবি কী করে?
—আগুনে দিলেই জাগবে। ছ্যাঁকার মতো জিনিস নেই।
আমরা শুকনো পাতা আর ডাল জোগাড় করে কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন জ্বেলে ফেললুম। আঁচ উঠতেই প্রথমে একটা ভূতকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলুম।
প্রথমে একটা উৎকট গন্ধ উঠল। তারপর আগুনটা হঠাৎ হাত দেড়েক লাফিয়ে উঠল। একটু কালো ধোঁয়া বেরিয়ে এল। তারপরই হড়াস করে অন্তত সাড়ে পাঁচ ফুট উঁচু একটা কেলে চেহারার বিকট ভূত আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখ দু—খানা কটমট করছে।
ওরে বাবা রে। বলে আমরা দৌড়োতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম। পড়ে গিয়ে দেখলুম জ্যান্ত ভূতটা আর চারটে ঘুমন্তে ভূতকে তুলে আগুনে ফেলে দিচ্ছে।
চোখের পলকে পাঁচ—পাঁচটা ভূত বেরিয়ে এল। তারপর হাসতে হাসতে তারা আমবাগানের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল।
ঘটনাটির কথা আমরা কাউকেই বলিনি। জয়তিলকবাবুর শূন্য কৌটোটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে এলুম।
সেই রাত্রি থেকে আমাদের বাড়িতে প্রবল ভূতের উপদ্রব শুরু হয়ে গেল।
রান্নাঘরে ভূত, গোয়ালে ভূত, শোয়ার ঘরে ভূত, পুকুরে ভূত, কুয়োপাড়ে ভূত। এই তারা হিঁ হিঁ করে হাসে, এই তারা মাছ চুরি করে খায়। এই ঝি—চাকরদের ভয় দেখায়। সে ভীষণ উপদ্রব। ভূতের দাপটে সকলেই তটস্থ।
জয়তিলকবাবু এইসব কাণ্ড দেখে নিজের কৌটো খুলে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, বললেন, এঃ হেঃ, ভূতগুলো পালিয়েছে তাহলে : ইস, কী দারুণ জাতের ভূত ছিল, বেচলে মেলা টাকা পাওয়া যেত। নাঃ, ভূতগুলোকে ধরতেই হয় দেখছি।
এই বলে জয়তিলকবাবু মাছের জাল নিয়ে বেরোলেন। ভূত দেখলেই জাল ছুড়ে মারেন। কিন্তু জালে ভূত আটকায় না। জয়তিলকবাবু আঠাকাঠি দিয়ে চেষ্টা করে দেখলেন। কিন্তু ভূতের গায়ে আঠাও ধরে না। এরপর জাপটে ধরার চেষ্টাও যে না করেছেন তাও নয়। কিন্তু কিছুতেই ভূতদের ধরা গেল না।
দুঃখিত জয়তিলকবাবু কপাল চাপড়ে আবার শুঁটকি ভূতের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।
পাঁচ—পাঁচটা ভূত দাপটে আমাদের বাড়িতে রাজত্ব করতে লাগল।

শিবেনবাবু ভালো আছেন তো!

হরসুন্দরবাবু একটু নাদুসনুদুস, ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মানুষ। তিনি কোঁচা দুলিয়ে ধুতি পরেন, ফুলহাতা জামার গলা অবধি বোতাম আঁটেন, কখনো হাতা গোটান না। শীত—গ্রীষ্ম সবসময়ে তিনি হাঁটু অবধি মোজা আর পাম্পশু পরেন। তাঁর বেশ মোটা একজোড়া গোঁফ আছে। চুলে পরিপাটি সিঁথি। হরসুন্দরবাবু খুব নিরীহ মানুষও বটে।

সেদিন মাসের পয়লা তারিখ। হরসুন্দরবাবু সেদিন বেতন পেয়েছেন। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরছেন। যে গলিটায় তিনি থাকেন সেটা বেশ অন্ধকার, পাড়াটাও ভালো নয়। হরসুন্দরবাবু গলিতে ঢুকে কয়েক পা এগোতেই তিনটে ছোকরা তাঁকে ঘিরে ফেলল। একজন বুকে রিভলভার ঠেকাল, একজন পেটে আর অন্যজন পিঠে দুটো ছোরা ধরল। রিভলভারওলা বলল, চেঁচাবেন না। যা আছে দিয়ে দিন।

হরসুন্দরবাবু খুবই ভয় পেলেন। ভয়ে তাঁর গলা কাঁপতে লাগল। বললেন, প্রাণে মেরো না ভাই। দিচ্ছি।

মাইনের পুরো টাকাটা নিয়ে তিনজন হাপিস হয়ে গেল। হরসুন্দরবাবু ভয়ে চেঁচামেচি করলেন না। যদি তারা ফিরে আসে। বাড়িতে ফিরেও কারও কাছে ঘটনাটা প্রকাশ করলেন না। ভাবলেন, এ মাসটা ধারকর্জ করে চালিয়ে নিলেই হবে।

তা নিলেনও হরসুন্দরবাবু। একটা মাস দেখতে দেখতে চলে গেল। আবার পয়লা তারিখ এল। হরসুন্দরবাবু আবার বেতন পেলেন।

ফেরার সময় যখন গলির মধ্যে ঢুকলেন তখন আচমকা ফের তিনটে লোক ঘিরে ধরল। বুকে রিভলভার, পেটে—পিঠে ছোরা।

রিভলভারওলা বলল, যা আছে দিয়ে দিন। চেঁচাবেন না।

হরসুন্দরবাবু ফের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, প্রাণে মেরো না ভাই। দিচ্ছি।

মাইনের টাকা নিয়ে লোক তিনটে হাপিস হয়ে গেল।

হরসুন্দরবাবু এবারও বাড়ি ফিরে কাউকে কিছু বললেন না। ভাবলেন, এ মাসটাও কোনোরকমে চালিয়ে নেবেন।

কষ্ট হল যদিও, কিন্তু হরসুন্দরবাবু চালিয়েও নিলেন। ফের পয়লা তারিখ এল। হরসুন্দরবাবু বেতন পেলেন।

বাড়ি ফেরার সময় অন্ধকার গলিতে ঠিক আগের মতোই তিনটে লোক ঘিরে ধরল তাঁকে। বুকে, পিঠে, পেটে ঠিক একই জায়গায় রিভলভার আর ছোরা ধরল। একই কথা বলল, এবং বেতনের টাকাটা নিয়ে হাওয়া হল।

হরসুন্দরবাবুর আজ চোখে জল।

বাড়ি ফিরে তিনি গুম হয়ে রইলেন। রাতে ভালো করে খেলেন না। গভীর রাতে তিনি ছাদে উঠে চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে অসহায়ভাবে ভাবলেন, কী যে করব বুঝতে পারছি না।

কাছেপিঠে কে যেন একটা হাই তুলল, তারপর আঙুল মটকানোর শব্দ হল, তারপর বলল, 'হরি, হরি'। হরসুন্দরবাবু চারদিকটা চেয়ে দেখলেন। ছাদ জনশূন্য, শীতকালের গভীর রাতে ছাদে আসবেই বা কে?

তিনি কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে?

ভেবে দেখতে হবে হে, ভেবে দেখতে হবে।

তার মানে?

কতবার জন্মেছি তার কী হিসেব আছে? কোন জন্মে কে ছিলুম তা যে গুবলেট হয়ে যায় বাপ। এ জন্মে বিশু তো ও জন্মে নিতাই, পরের জন্মে হয়তো চীনেম্যান চাঁই চুঁই।

আ—আপনি কোথায়? দে—দেখতে পাচ্ছি না তো!

গলার স্বরটা খিঁচিয়ে উঠে বলল, দেখার চোখ আছে কি তোমার যে দেখবে? সারাদিনই তো তোমার ধারে—কাছে ঘুরঘুর করি, দেখতে চেয়েছ কি কখনো?

আজ্ঞে, আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না। ভয় পাচ্ছি, মাথা ঝিমঝিম করছে।

আ মোলো! এ যে ভালো করতে এসে বিপদ হল!

আ—আপনি কী চান?

তোমার মতো গবেটদের কান দুটো মলে দিতেই চাই হে। কিন্তু বিধি বাম, সে উপায় নেই।

আমি কী করেছি? আপনি আমার ওপর রাগ করছেন কেন?

রাগ করব না? তিনটে কাঁচা মাথার ছোঁড়া তিন—তিনবার যে তোমাকে বোকা বানাল তা থেকে শিক্ষা পেয়েছ কি? কিছু করতে পারলে?

আজ্ঞে কী করব? তাদের হাতে যে ছোরা আর বন্দুক।

আর তোমার বুঝি কিছু নেই?

আজ্ঞে না।

কে বলল নেই?

ইয়ে, আমার বন্দুক, পিস্তল বা ছোরাছুরি নেই। তবে আমার গিন্নির একখানা বঁটি আছে, আর আমার ছেলে ভুতোর একটা পেনসিল কাটা ছুরি আছে, আর আমার মায়ের বেড়াল তাড়ানোর জন্য একখানা ছোটো লাঠি আছে।

আহা, ওসব জানতে চাইছে কে? বঁটি—লাঠির কথা জিজ্ঞেস করেছি কী তোমায়? বলি এসব ছাড়া তোমার আর কিছু নেই?

আজ্ঞে, মনে পড়ছে না। শুনেছি আমার ঠাকুরদার একটা গাদা বন্দুক ছিল।

গবেট আর কাকে বলে? বলি বন্দুক—টন্দুক ছাড়া আর কিছু নেই তোমার?

আজ্ঞে না।

বলি, বুদ্ধি বলে একটা বস্তু আছে জানো তো!

জানি।

তোমার সেটাও নেই?

আজ্ঞে, ঠিক বুঝতে পারছি না।

একটা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ হল। তারপর গলার স্বরটা বলল, শোনো, এবার যখন ওই মর্কটগুলো তোমাকে পাকড়াও করবে তখন একটুও ঘাবড়াবে না। হাসি—হাসি মুখ করে শুধু জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো!

শুধু এই কথা বললেই হবে?

বলেই দ্যাখো না।

তৃতীয় মাসটাও কষ্টেসৃষ্টে কেটে গেল। আবার পয়লা তারিখ এল এবং হরসুন্দরবাবু আবার বেতন পেলেন।

বাড়ি ফেরার সময় বুকটা দুরুদুরু করছিল। যে—কথাটা বলতে হবে তা বার বার বিড়বিড় করে আওড়াচ্ছেন। হাত—পা কাঁপছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। গলির মুখে এসে একটু থমকে দাঁড়ালেন। তারপর দুর্গা বলে অন্ধকারে পা বাড়ালেন।

কয়েক পা যেতে—না—যেতেই তিন মূর্তি ঘিরে ফেলল তাঁকে। বুকে পিস্তল, পেটে আর পিঠে ছোরা।

পিস্তলওলা বলল, চেঁচাবেন না। যা আছে দিয়ে দিন।

জীবনে কোনো সাহসের কাজ করেননি হরসুন্দরবাবু। আজই প্রথম করলেন। জোর করে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তা?

ছেলে তিনটে হঠাৎ যেন থমকে গেল। আর তার পরেই দুড়দাড় দৌড়ে এমনভাবে পালাল যেন ভূত দেখেছে।

হরসুন্দরবাবু খুবই অবাক হয়ে গেলেন। এই সামান্য কথায় এত ভয় পাওয়ার কী আছে? যাকগে, এবার মাইনের টাকাটা তো বেঁচে গেল!

না, এর পর থেকে হরসুন্দরবাবুকে আর ওদের পাল্লায় পড়তে হয়নি বটে, কিন্তু তাঁর ধাঁধাটা গেল না। এই তো সেদিন তাঁর অফিসের বড়োবাবু তাঁকে কাজের একটা ভুলের জন্য খুব বকাঝকা করে চার্জশিট দেন আর কী।

হরসুন্দরবাবু শুধু হাসি—হাসি মুখ করে তাঁকে বলেছিলেন, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো! তাইতে বড়োবাবু এমন ঘাবড়ে গেলেন যে আর বলার নয়। তারপর থেকে খুবই ভালো ব্যবহার করে যাচ্ছেন।

সেদিন বাজার থেকে পচা মাছ এনেছিলেন বলে হরসুন্দরের গিন্নি তাঁকে খুবই তুলোধোনা করেছিলেন। হরসুন্দরবাবু তাঁকেও বললেন, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো! গিন্নি একেবারে জল।

হ্যাঁ, এখন হরসুন্দরবাবু খুবই ভালো আছেন। কোনো উদবেগ, অশান্তি নেই। বিপদ দেখা দিলেই তিনি শুধু বলেন, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো! মন্ত্রের মতো কাজ হয়।

শারদীয়া ১৪০৪

কালাচাঁদের দোকান

নবীনবাবু গরিব মানুষ। পোস্ট অফিসের সামান্য চাকরি। প্রায়ই এখানে—সেখানে বদলি যেতে হয়। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের ভাবসাব নেই। প্রায়ই ধারকর্জ হয়ে যায়। ঋণ শোধ দিতে নাভিশ্বাস ওঠে। নবীনবাবুর গিন্নি স্বামীর ওপর হাড়ে চটা। একে তো নবীনবাবুর ট্যাঁকের জোর নেই, তার ওপর লোকটা বড্ড মেনিমুখো আর মিনমিনে। এই যে যখন—তখন যেখানে—সেখানে বদলি করে দিচ্ছে, নবীনবাবু যদি রোখাচোখা মানুষ হতেন তবে পারত ওরকম বদলি করতে? বদলির ফলে ছেলেপুলেগুলোর লেখাপড়ার বারোটা বাজছে। আজ এ স্কুল কাল অন্য স্কুল করে বেড়ালে লেখাপড়া হবেই বা কী করে?

এবার নবীনবাবু নিত্যানন্দপুর বলে একটা জায়গায় বদলি হলেন। খবরটা পেয়েই গিন্নি বললেন, 'আমি যাব না, তুমি যাও। আমি এখানে বাসাভাড়া করে থাকব। আর বদলি আমার পোষাচ্ছে না বাবু!'

নবীনবাবু মাথা চুলকে বললেন, 'তাতে খরচ বাড়বে বই কমবে না। ওখানে আমারও তো আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। দুটো এস্টাব্লিশমেন্ট টানব কী করে?'

গিন্নি বললেন, 'ঠিক আছে, যাব। কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে এরপর বদলি করলে তুমি কিছুতেই বদলি হতে রাজি হবে না। সরকারকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে হবে যে, তুমি দরকার হলে মামলা করবে। তোমার মতো মেনিমুখো পুরুষদের পেয়েই তো নাকে দড়ি দিয়ে ওরা ঘোরায়।'

নবীনবাবু মিনমিন করে বললেন, 'একখানা দরখাস্ত নিয়ে ওপরওয়ালার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তা তিনি বললেন, নিত্যানন্দপুর থেকে আর বদলি করবে না। দেখা যাক।'

বাক্স—প্যাঁটরা গুছিয়ে সপরিবারে এক শীতের সন্ধ্যেবেলা নবীনবাবু নিত্যানন্দপুরে এসে পৌঁছোলেন। বেশ ধকল গেল। ট্রেন থেকে নেমে অনেকটা পথ গোরুর গাড়িতে এসে তারপর আবার নদী পেরিয়ে আরও ক্রোশ দুই পেরোলে তবে নিত্যানন্দপুর। গঞ্জমতো জায়গা। তবে নিরিবিলি, ফাঁকা—ফাঁকা।

রাত্রিটা পোস্টমাস্টারের বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন একখানা বাসা ভাড়া করলেন। পাকা বাড়ি, টিনের চাল। উঠোন আছে, কুয়ো আছে।

জায়গাটা ভালোও নয়, মন্দও নয়। ওই একরকম। তবে ভরসা এই যে, আর বার বার ঠাঁইনাড়া হতে হবে না : ওপরওয়ালা কথা দিয়েছে এখানেই বাকি চাকরির জীবনটা কাটাতে পারবেন নবীনবাবু।

তাঁর স্ত্রী অবশ্য নাক সিঁটকে বললেন, 'কী অখেদ্দে জায়গা গো! এ যে ধাড়ধাড়া গোবিন্দপুর। অসুখ হলে ডাক্তারবদ্দি পাওয়া যাবে কি না খোঁজ নিয়ে দেখো। দোকানপাটও তো বিশেষ নেই দেখছি। বাজারহাট কোথায় করবে?'

নবীনবাবু বললেন, 'বাজার এখান থেকে এক ক্রোশ। তাও রোজ বসে না। হপ্তায় দু—দিন হাট।'

'তবেই হয়েছে। এখানে ইস্কুলটা কেমন খোঁজ নিয়েছ?'

'ইস্কুল একটা আছে মাইলটাক দূরে। কেন কে জানে।'

'জায়গাটা এমন বিচ্ছিরি বলেই এখান থেকে তোমাকে আর বদলি না করতে ওপরওয়ালা সহজেই রজি হয়ে গেছে। এখন মরি আমরা এখানে পচে।'

নবীনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'কী আর করা। নিত্যানন্দপুরেই মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে।'

প্রথমদিন বাজার করতে দু—ক্রোশ দূরে গিয়ে বেশ দমেই গেলেন তিনি। জিনিসপত্রের দাম বেশ চড়া। প্রত্যন্ত গাঁ, এখানে জিনিস আনতে ব্যাপারিদের অনেক খরচ হয়। জিনিসপত্র তেমন ভালোও নয়। পাওয়াও যায় না সবকিছু।

বাজারের হাল শুনে গিন্নি চটলেন। বললেন, 'আবার দরখাস্ত করে অন্য জায়গায় বদলি নাও। এ জায়গায় মানুষে থাকে? মা গো!'

নবীনবাবু ফাঁপড়ে পড়লেন। এখন কী করা যাবে তাই ভাবতে লাগলেন।

একদিন সন্ধ্যেবেলা গিন্নি এসে বললেন, 'ওগো, খুকি তেলের শিশিটা ভেঙে ফেলেছে। একটি ফোঁটাও তেল নেই আর। রাতে রান্না হবে কী দিয়ে?'

'তেল পাব কোথায়?'

'দ্যাখো না একটু খুঁজে পেতে। অনেক গেরস্তবাড়িতে ছোটোখাটো জিনিস পাওয়া যায় শুনেছি।'

অগত্যা নবীনবাবু বেরোলেন। বেশি লোকের সঙ্গে চেনাজানা হয়নি এখনও। কার বাড়ি যাবেন ভাবছেন। ডান হাতি পথটা ধরে হাঁটছেন। ডান ধারে একটু জঙ্গলমতো আছে। হঠাৎ দেখতে পেলেন, জঙ্গলের একটু ভেতর দিকে একটা আলোই যেন জ্বলছে মনে হল। নবীনবাবু কয়েক পা এগিয়ে ঠাহর করে দেখলেন একখানা ঝাঁপতোলা দোকান বলেই যেন মনে হচ্ছে। নবীনবাবু এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, দোকানঘরই বটে। দীনদরিদ্র চেহারা হলেও দোকানই। কালো রোগাপনা কণ্ঠিধারী একজন লোক দোকানে বসে আছে। বিনয়ী মানুষ। নবীনবাবুকে দেখেই টুল থেকে উঠে বলল, 'আজ্ঞে আসুন।'

নবীনবাবু খুশি হলেন। আজকাল বিনয় জিনিসটা দেখাই যায় না। সরষের তেলের খোঁজ করতেই লোকটা বলল, 'আছে। ভালো ঘানির তেল।'

'কত দাম?'

লোকটা হেসে মাথা চুলকে বলল, 'দাম তো বেশ চড়া। তবে আপনার কাছ থেকে বেশি নেব না। ছ—টাকা করেই দেবেন।'

নবীনবাবু খুবই অবাক হলেন, দু—ক্রোশ দূরের বাজারে তেল দশ টাকা। নবীনবাবু আড়াইশো গ্রাম তেল কিনে আনলেন। গিন্নি তেল পরীক্ষা করে বললেন, 'বাঃ, এ তো দারুণ ভালো তেল দেখছি। কোথায় পেলে গো?'

নবীনবাবু বললেন, 'আরে, কাছেই একটা বেশ দোকানের সন্ধান পেয়েছি। লোকটা বড়ো ভালো।'

লোকটা যে সত্যিই ভালো তার প্রমাণ পাওয়া গেল দু—দিন পরেই। ডাল ফুরিয়েছে। সন্ধ্যের পর সেই দোকানে গিয়ে হানা দিতেই বিনয়ী লোকটা প্রায় অর্ধেক দামে ডাল দিল। বলল, 'আপনাকে অত দাম দিতে হবে না।'

নবীনবাবু ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার নামই তো জানি না এখনও।'

'আজ্ঞে, কালাচাঁদ নন্দী। 'কালো' বলেই ডাকবেন।'

'আপনি কি সব জিনিসই রাখেন কালোবাবু?'

'যে আজ্ঞে। তবে সন্ধ্যের পর আসবেন। দিনমানে আমি দোকান খুলি না। ও সময়ে আমার চাষবাস দেখতে হয়।'

দিন দুই পর গিন্নি হঠাৎ বললেন, 'ও গো, আজ একটু পোলাও খাওয়ার বায়না ধরেছে ছেলেমেয়েরা। ঘি আর গরম মশলা লাগবে। এনে দেবে নাকি একটু?'

কালোর দোকানে ঘি বা গরম মশলা পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছিল না নবীনবাবুর। দোনামনা করে গেলেন।

কালাচাঁদ বলল, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ, কেন পাবেন না? এক নম্বর ঘি আছে, আর বাছাই গরম মশলা।'

'দাম?'

'দাম তো অনেক। তবে আপনাকে অত দিতে হবে না। দশ টাকা করেই দেবেন।'

নবীনবাবুর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। খানিকক্ষণ কালাচাঁদের সঙ্গে সুখ—দুঃখের কথা বলে তিনি ফিরে এলেন। গিন্নি ঘি আর গরম মশলা দেখে খুব খুশি। বললেন, 'ওগো, দোকানটা খোকাকে চিনিয়ে দিয়ো তো! দরকারমতো ওকেও পাঠাতে পারব। তা হ্যাঁ গো, দোকানটা কি নতুন খুলেছে? আজ দাস বাড়ির গিন্নি গল্প করতে এসেছিল। কথায়—কথায় তাকে কালাচাঁদের দোকানের কথা বললুম। কিন্তু সে তো আকাশ থেকে পড়ল, 'সাত জন্মে কালাচাঁদবাবুর দোকানের কথা শুনিনি।'

'হবে হয়তো, নতুনই খুলেছে। আমি খোঁজ নিয়ে বলব'খন।'

দু—দিন পর ফের কালোজিরে আর ময়দা আনতে গিয়ে নবীনবাবু বললেন, 'তা হ্যাঁ কালাচাঁদবাবু, আপনার দোকানটা কতদিনের পুরোনো?'

কালাচাঁদ ঘাড়টাড় চুলকে অনেক ভেবে বলল, 'তা কম হবে না। ধরুন, এ—গাঁয়ের পত্তন থেকেই আছে।'

নবীনবাবুর একটু খটকা লাগল। দোকান যদি এত পুরোনোই হবে তাহলে দাস—গিন্নি এ দোকানের কথা শোনেনি কেন?

কালাচাঁদ যেন তাঁর মনের কথা পড়ে নিয়েই বলল, 'এ—গাঁয়ে আমার অনেক শত্রু। লোকের কথায় কান দেবেন না।'

'আচ্ছা তাই হবে।'

পরদিন নবীনবাবু দাস বাড়িতে নারায়ণপুজোর নেমন্তন্ন খেয়ে ফেরার পরই গিন্নি বললেন, 'হ্যাঁ গো তোমার কালাচাঁদের দোকানটা কোথায় বলো তো! খোকাকে কুয়োর দড়ি আনতে পাঠিয়েছিলাম, সে তো দোকানটা খুঁজেই পেল না। পোস্ট অফিসের পিয়ন বিলাস এসেছিল। সেও বলল, 'ওরকম দোকান এখানে থাকতেই পারে না।' বলল 'নবীনবাবুর মাথাটাই গেছে'।'

নবীনবাবুর বুকের মধ্যে একটু যেন কেমন করল। মুখে বললেন, 'কালাচাঁদের সঙ্গে অনেকের শত্রুতা আছে কিনা, তাই ওরকম বলে।'

পরদিন টর্চের ব্যাটারি আনতে গিয়ে নবীনবাবু এ—কথা সে—কথার পর কালাচাঁদকে বললেন, 'তা কালাচাঁদবাবু আমার ছেলেও কাল আপনার দোকানটা খুঁজে পায়নি।'

কালাচাঁদ বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'আর কাউকে পাঠানোর দরকার কী? নিজেই আসবেন।'

'ইয়ে অন্যরা সব বলছে যে, কেউ নাকি এ—দোকানের কথা জানে না।'

কালাচাঁদ তেমনই মৃদু—মৃদু হেসে বলে, 'জানার দরকারই বা কী? আপনার ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

নবীনবাবুর বুকটা একটু দুরু—দুরু করে উঠল। বললেন, 'হ্যাঁ, তা আমি তো আছিই। কিন্তু আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো খদ্দের কখনো দেখি না। দোকানটা চলে কী করে?'

কালাচাঁদ বিনীতভাবে বলল, 'একজনের জন্যই তো দোকান।'

'অ্যাঁ!'

কালাচাঁদ হাসল, 'আসবেন।'

নবীনবাবু চলে এলেন। কিন্তু তারপর আবার পরদিনই গেলেন। মাসের শেষ, হাতে টাকা নেই। খুব সংকোচের সঙ্গে বললেন, 'কয়েকটা জিনিস নেব। ধারে দেবেন?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, কেন নয়?'

'পরের মাসে মাইনে পেয়েই দিয়ে যাব।'

'তাড়া কীসের?'

ধারে প্রচুর জিনিস নিয়ে এলেন নবীনবাবু। পরের মাসে ধার শোধ করতে গেলে কালাচাঁদ জিভ কেটে বলল, 'না না অত নয়। আমার হিসেব সব লেখা আছে। পাঁচটি টাকা মোটে পাওনা। তাও সেটা দু—দিন পর হলেও চলবে। বসুন, সুখ—দুঃখের কথা কই। টাকাপয়সার কথা থাক।'

নবীনবাবু খুবই অবাক হলেন। পাঁচ টাকা পাওনা! বলে কী লোকটা! তিনি অন্তত দেড়শো টাকার জিনিস নিয়েছেন।

তা এভাবেই চলল। চাল, ডাল, মশলাপাতি, ঘি, তেল সবই কালাচাঁদের দোকান থেকে আনেন নবীনবাবু। মনোহারি জিনিস, বাচ্চাদের খেলনা, পোশাক, শাকসবজিও ক্রমে ক্রমে আনতে লাগলেন। মাছ—মাংসও পাওয়া যেতে লাগল কালাচাঁদের আশ্চর্য দোকানে। গিন্নি খুশি। নবীনবাবুর মাইনে অর্ধেকের ওপর বেঁচে যাচ্ছে।

নবীনবাবু একদিন গিন্নিকে বললেন, 'ওগো নিত্যানন্দপুর থেকে বদলি হওয়ার দরখাস্তটা আর জমা দেওয়া হয়নি।'

'দিয়ো না। হ্যাঁ গো কালাচাঁদের দোকানটা ঠিক কোথায় বলো তো। আমাকে একদিন নিয়ে যাবে?'

নবীনবাবু শশব্যস্তে বললেন, 'না—না, তোমাদের কারও যাওয়ার দরকার নেই। সকলের কী সব সয়?'

গিন্নি চুপ করে গেলেন।

নবীনবাবু নিত্যানন্দপুরেই রয়ে গেলেন।

কোগ্রামের মধু পণ্ডিত

বিপদে পড়লে লোকে বলে 'ত্রাহি মধুসূদন'। তা কোগ্রামের লোকেরাও তাই বলত। কিন্তু তারা কথাটা বলত মধুসূদন পণ্ডিতকে। বাস্তবিক মধুসূদন ছিল কোগ্রামের মানুষদের কাছে সাক্ষাৎ দেবতা। যেমনি বামনাই তেজ, তেমনি সর্ববিদ্যা বিশারদ। চিকিৎসা জানতেন, বিজ্ঞান জানতেন, চাষবাস জানতেন, মারণ উচাটন জানতেন, তাঁর আমলে গাঁয়ের লোক মরত না।

সাঁঝের বেলা একদিন কোষ্ঠকাঠিন্যের রুগি কালাবাবু মধুসূদনের বাড়িতে পাঁচন আনতে গেছেন। গিয়ে দেখেন গোটা চারেক মুশকো চেহারার গোঁফওয়ালা লোক উঠানে হারিকেনের আলোয় খেতে বসেছে আর মধুগিন্নি তাদের পরিবেশন করছে। লোকগুলোর চেহারা ডাকাতের মতো, চোখ চারদিকে ঘুরছে, পাশে পেল্লায় পেল্লায় চারটে কাঁটাওলা মুগুর রাখা।

মধু পণ্ডিত বগলাবাবুকে বলল, ওই চারজন অনেক দূর থেকে এসেছে তো, আবার এক্ষুনি ফিরে যাবে, অনেকটা রাস্তা, তাই খাইয়ে দিচ্ছি।

কথাটায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। মধু পণ্ডিতের বাড়ির উনুনকে সবাই বলে রাবণের চিতা। জ্বলছে তো জ্বলছেই, অতিথিরও কামাই নেই, অতিথি সৎকারেরও বিরাম নেই। বগলাবাবু বললেন, তা ভালো কিন্তু আমারও অনেকটা পথ যেতে হবে, পাঁচনটা করে দাও।

মধু পণ্ডিত বলে, আরে বোসো, হয়ে যাবে এক্ষুনি। ওই চারজন বরং তোমাকে খানিকটা এগিয়ে যাবে'খন। শচীনখুড়োকে নিতে এসেছিল, তা আমি বারণ করে দিয়েছি।

বগলাবাবু চমকে উঠে বললেন, শচীনখুড়োকে কোথায় নেবে! খুড়োর যে এখন তখন অবস্থা। এই তিনবার শ্বাস উঠল।

সেইজন্যেই তো নিতে এসেছিল।

বগলাবাবু ভালো বুঝলেন না। পাঁচন তৈরি হল, লোকগুলোও খাওয়া ছেড়ে উঠল।

মধু পণ্ডিত হুকুম করল, এই, তোরা বগলাদাদাকে একটু এগিয়ে দিয়ে যা।

বগলাবাবু কিন্তু—কিন্তু করেও ওদের সঙ্গে চললেন। বাড়ির কাছাকাছি এসে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা বাবারা?

লোকগুলো পেন্নাম ঠুকে বলল, আজ্ঞে যমরাজার দূত, প্রায়ই আসি এদিক পানে। তবে সুবিধে করতে পারি না। ওদিকে যমমশাইকেও কৈফিয়ত দিতে হয়। কিন্তু মধু পণ্ডিত কাউকেই ছাড়ে না।

সেই কথা শুনে কালাবাবু ভিরমি খেলেন বটে, কিন্তু মধু পণ্ডিতের খ্যাতি আরও বাড়ল।

হরেন গোঁসাইয়ের টিনের চালে একদিন জ্যোৎস্না রাতে ঢিল পড়ল। হরেন গোঁসাই হচ্ছেন গাঁয়ের সবচেয়ে বুড়ো লোক, বয়স দেড়শো বছরের কিছু বেশি। ডাকাবুকো লোক। একদিন লাঠি হাতে বেরিয়ে এসে হাঁক দিলেন, কে রে?

মাথা চুলকোতে চুলকোতে একটা তালগাছের মতো লম্বা সুড়ুঙ্গে চেহারার লোক এগিয়ে এসে বলল, আপনারা কী অশৈরী কাণ্ড শুরু করলেন বলুন তো! গাঁয়ের ভূত যে সব শেষ হয়ে গেল।

হরেন গোঁসাই হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন, তার মানে?

মানে আর কী বলব বলুন। ভূতরা হল আত্মা। চিরকাল ভূতগিরি তো তাদের পোষায় না। ডাক পড়লেই আবার মানুষের ঘরে গিয়ে জন্ম নিতে হয়। মানুষ মরে আবার টাটকা ছানা—ভূতেরা আসে। তা মশাই এই কোগ্রামে আমরা মোট হাজারখানেক ভূত ছিলাম। কিন্তু গত দেড়শো বছর ধরে একটাও নতুন ভূত আসেনি।

ওদিকে একটি একটি করে ভূত গিয়ে মানুষ হয়ে জন্মাচ্ছে। ইদানীং তো একেবারে জন্মের মড়ক লেগেছে আজ্ঞে। গত মাসখানেকে এক চোপাটে চুয়াল্লিশটা ভূত গায়েব হয়ে গেল। সর্দার রাগারাগি করবে।

তা আমি কী করব?

লজ্জায় মাথা খেয়ে বলি, আপনারা কী সব মরতে ভুলে গেছেন? আপনার দিকে তাকিয়ে ছিলাম বড়ো আশা নিয়ে। কিন্তু আপনিও বেশ ধড়িবাজ লোক আছেন মাইরি। তা মধু পণ্ডিতের ওষুধ না খেলেই কী নয়?

ভারি অসন্তুষ্ট হয়ে ভূতটা চলে গেল। কিন্তু ক—দিন পরই এক রাতে গাঁয়ের লোক সভয়ে ঘুম ভেঙে শুনল, রাস্তা দিয়ে এক অশরীরী মিছিল চলেছে। তাতে স্লোগান উঠছে, মধু পণ্ডিত নিপাত যাক! নিপাত যাক! নিপাত যাক। এ তন্দরুস্তি ঝুটা হ্যায় ভুলো মৎ, ভুলো মৎ, এ এলার্জি ঝুটা হ্যায়! ভুলো মৎ। ভুলো মৎ। মধুর নিদান মানছি না। মানছি না। মানব না।

কিন্তু মাস তিনেক পর একদিন সুড়ুঙ্গে ভূতটা খুব কাঁচুমাচু হয়ে মধু পণ্ডিতের বাড়িতে হাজির হল সন্ধ্যেবেলায়।

মধু তামাক খাচ্ছিল, একটু হেসে বলল, কি হে শুনলাম আমার বিরুদ্ধে খুব লেগেছ তোমরা।

পেন্নাম হই পণ্ডিতমশাই, ঘাট হয়েছে।

কী হয়েছে বাপু?

আজ্ঞে একা আমি আর সর্দার ছিলাম গতকাল অবধি। আর সব জন্মের মড়কে গায়েব হয়ে গেছে। কিন্তু কাল রাতে একেবারে সাড়ে সর্বনাশ, আমাদের বুড়ো সর্দার পর্যন্ত মানুষের ঘরে গিয়ে জন্ম নিয়ে ফেলেছে। আমি একেবারে একা।

একা তো ভালোই, চরে বরে খা গে। এখন তো তোরই একচ্ছত্র রাজত্ব।

জিব কেটে ভূতটা বলল, কী যে বলেন! একা হয়ে এক প্রাণে আর জল নেই। বড্ড ভয় ভয় করছে আজ্ঞে। খেতে পারচি না, শুতে পারচি না। রাতে শেয়াল ডাকে, প্যাঁচা ডাকে, আমি কেঁপে কেঁপে উঠি।

তা তোর ভয়টা কীসের?

আজ্ঞে, একা হওয়ার পর থেকে আমার ভূতের ভয়ই হয়েছে, যমরাজের পেয়াদাগুলোও ভীষণ ট্যাটন। একা পেয়ে যাতায়াতের পথে আমাকে ডাঙস মেরে যায়।

ঠিক আছে, তুই বরং আমার সঙ্গেই থাক।

সেই থেকে সুড়ুঙ্গে ভূতটা মধু পণ্ডিতের বাড়িতে বহাল হল।

একদিন জমিদার কদম্বকেশরের ভাইপো কুন্দকেশর এসে হাজির। গম্ভীর গলায় বললেন, ওহে মধু, একটা কথা ছিল।

মধু তটস্থ হয়ে বলল, আজ্ঞে বলুন।

আমার বয়স কত জানো?

বেশি বলে তো মনে হয় না।

কুন্দকিশোর একটা শ্বাস ছেড়ে বলেন, পঁচানব্বই, বুঝলে? পঁচানব্বই। আমার কাকা কদম্বকেশরের বয়স জানো?

খুব বেশি আর কী হবে?

তোমার কাছে বেশি না লাগলেও, বেশিই। একশো পঁচিশ বছর।

তা হবে।

আমার কাকা নিঃসন্তান তা তো অন্তত জানো।

মধু পণ্ডিত মাথা চুলকে বলে, তা জানি, উনি গত হলে আপনারই সব সম্পত্তি পাওয়ার কথা।

জানো তাহলে? বাঁচালে, তাহলে এও নিশ্চয়ই জানো কাকার সম্পত্তি পাব এরকম একটা ভরসা পেয়েই আমি গত সত্তরটা বছর কাকার আশ্রয়ে আছি, জানো একদিন জমিদার হয়ে ছড়ি ঘোরাব বলে আমি ভালো করে লেখাপড়া করিনি পর্যন্ত? একদিন জমিদারনি হবে এই আশায় আমার গিন্নি এখনও বুড়ো বয়সেও সে বাড়িতে ঝি—এর অধম খাটে, তা জানো, আমার বড়োছেলের বয়স পঁচাত্তর পেরিয়েছে। শোনো বাপু, কাকা মরুক এ আমি চাই না। কিন্তু হক্কের মরাই বা লোকে মরছে না কেন? মরলে আমি কান্নাকাটিও করব, কিন্তু মরবে কোথায়। আর নাই যদি মরে বাপু, তবে অন্তত সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয় তো যেতে পারে। বৈরাগী হয়ে পথে পথে দিব্যি বাউল গান তো গেয়ে বেড়াতে পারে। তা তোমার ওযুধে কি সে সবেও বারণ নাকি? তোমার নামে লোকে যে কেন মামলা করে না সেইটেই বুঝি না।

মধু পণ্ডিত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আপনার বয়স হয়েছে জানি, কিন্তু তাতে ভয় খাচ্ছেন কেন? বয়স তো একটা সংস্কার মাত্র, শরীর যদি সুস্থ সবল থাকে, মানসিকতা যদি স্বাভাবিক থাকে আপনি একশো বছরেও

যুবক। উলটো হলে পঁচিশ বছরেও বুড়ো। এই আপনার কাকাকেই দেখুন না। মোটে তো সোয়াশো বছর বয়স, দেড়শো পেরিয়েও দিব্যি হাঁকডাক করে বেঁচে থাকবেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুন্দকেশর বললেন, বলছ?

নির্যস সত্যি কথা।

কুন্দকেশর চলে গেলেন। কিছুদিন পর শোনা গেল, তিনি বিরানব্বই বছরের স্ত্রী আর পঁচাত্তর বছরের বড়োছেলের হাত ধরে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছেন।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, প্রচণ্ড বর্ষা নেমেছে আজ। মেঘ ডাকছে। ঝড়ের হাওয়া বইছে। এই দুর্যোগে হঠাৎ মধু পণ্ডিতের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। দরজা খুলে মধু একটু অবাক, বেশ দশাসই চেহারার একজন মানুষ দাঁড়িয়ে। গায়ে ঝলমলে জরির পোশাক। ইয়া গোঁপ, ইয়া বাবরি, ইয়া গালপাট্টা, মাথায় একটা ঝলমলে টুপি, তাতে ময়ূরের পালক, গায়ের রং মিশমিশে কালো বটে, কিন্তু তবু লোকটি ভারি সুপুরুষ।

মধু পণ্ডিত হাতজোড় করে বললেন, আজ্ঞে আসুন আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

আমি তোমার যম। জলদগম্ভীর স্বরে লোকটা বলল।

শুনে মধু পণ্ডিত একটু চমকে উঠল। খুন করবে নাকি? কোমরে একটা ভোজালিও দেখা যাচ্ছে। কাঁপা গলায় মধু বলল, আজ্ঞে।

লোকটা হেসে বলল, ভয় পেয়ো না বাপু। আমি ভয় দেখাতে আসিনি। বরং বড়ো ভাইয়ের মতো পরামর্শ দিতে এসেছি। তুমি এই গাঁ না ছাড়লে আমি কাজ করতে পারছি না। আমি যে সত্যিই যমরাজা তা বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই।

মধু দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে উঠে মাথা চুলকে বলে, আপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু শ্বশুরবাড়িটা কোথায় ছিল তা ঠিক মনে হচ্ছে না।

বলো কী! যমের চোখ কপালে উঠল, শ্বশুরবাড়ি লোকে ভোলে?

আজ্ঞে অনেক দিনের কথা তো, দাঁড়ান গিন্নিকে জিজ্ঞেস করে আসি, বলে মধু পণ্ডিত ভিতরবাড়ি থেকে ঘুরে এসে একগাল হেসে বলে, এই বর্ধমানের গোবিন্দপুর। কিন্তু গিয়ে লাভ নেই। আমার শ্বশুর—শাশুড়ি গত হয়েছেন।

যমরাজ বলেন, তা শালা—শালীরা তো আছে।

ছিল, এখন আর নেই।

তাদের ছেলেমেয়েরা সব।

আজ্ঞে তারাও গত হয়েছে। তস্য পুত্র—পৌত্রাদিরা আছে বটে। কিন্তু তারাও খুব বুড়ো। গিয়ে হাজির হলে চিনতে পারবে না।

যমরাজ গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমার বয়স কত মধু?

আজ্ঞে মনে নেই।

যমরাজ ডাকলেন, চিত্রগুপ্ত! মধুর হিসেবটা দ্যাখো তো।

রোগা সুড়ুঙ্গে একটা লোক গলা বাড়িয়ে বলল, আজ্ঞে দুশো পঁচিশ।

ছিঃ ছিঃ মধু! যমরাজ অভিমানভরে বললেন, এতদিন বাঁচতে তোমার ঘেন্না হওয়া উচিত ছিল। থাকগে আমি তোমাকে কিছু বলব না। পৃথিবীর নিয়ম ভেঙে চলছ চলো। মজা টের পাবে।

যমরাজ চলে গেলেন। মধু কিছুদিনের মধ্যেই টের পেতে লাগল।

হয়েছে কী, মধুর ওষুধ যে শুধু মানুষ খায় তা নয়। রোদে শুকুতে দিলে পাখিপক্ষী খায়, ঘরে রাখলে পিঁপড়ে ধেড়ে ইঁদুরেও ভাগ বসায়। তাদেরও হঠাৎ আয়ু বাড়তে লাগল। কোগ্রামের মশা মাছি পর্যন্ত মরত না। বরং দিন দিন মশা, মাছি, পিঁপড়ে, ইঁদুর ইত্যাদির দাপট বাড়তে লাগল। আরও মুশকিল হল জীবাণুদের নিয়ে। কলেরা রুগিকে ওষুধ দিয়েছে মধু, তা সে ওষুধ কলেরার পোকাও খানিকটা খেয়ে নেয়। ফলে রুগিও

মরে না, কিন্তু তার কলেরাও সারতে চায় না। সান্নিপাতিক রুগিরও সেই দশা, কোগ্রামে ঘরে ঘরে রুগি দেখা দিতে লাগল। তারা আর ওঠা হাঁটাচলা করতে পারে না। কিন্তু ওষুধের জোরে বেঁচে থাকে।

এক শীতের রাতে আবার যমরাজা এলেন।

মধু! কী ঠিক করলে?

আজ্ঞে লোকে বড়ো কষ্ট পাচ্ছে।

তা তো একটু পাবেই। এখনও বলো যমের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাও কিনা।

শশব্যস্ত দণ্ডবত হয়ে মধু পণ্ডিত বলে, আজ্ঞে না। তবে এখন যদি ওষুধ বন্ধ করি তবে চোখের পলকে গাঁ শ্মশান হয়ে যাবে। একশো বছর বয়সের নীচে কোনো লোক নেই।

যমরাজা গম্ভীর হয়ে বলেন, তা একটা ভাববার কথা বটে। তোমার এত প্রিয় গাঁ তাকে শ্মশান করে দিতে কি আমারই ইচ্ছে? তবে একটা কথা বলি মধু। যেমন আছো থাকো সবাই। তবে গাঁয়ের বাইরে মাতব্বরি করতে কখনো যেয়ো না। আমি গণ্ডি দিয়ে গেলাম। শুধু এই কোগ্রামের তোমরা যতদিন খুশি বেঁচে থাকো। অরুচি যতক্ষণ না হয়। তবে বাইরের কেউ এই গাঁয়ের সন্ধান পাবে না। কানাওলা ভূত চারদিকে পাহারায় থাকবে। কোনো লোক এদিকে এসে পড়লে অন্য পথে তাদের ঘুরিয়ে দেবে।

মধু দণ্ডবত হয়ে বলে, যে আজ্ঞে।

সেই থেকে আজও শোনা যায়, কোগ্রামের কেউ মরে না। কিন্তু কোথায় সেই গ্রাম তা খুঁজে খুঁজে লোকে হয়রান। আজও কেউ খোঁজ পায়নি।

মাঝি

জয়চাঁদ বিকেলের দিকে খবর পেল, তার মেয়ে কমলির বড়ো অসুখ, সে যেন আজই একবার গাঁয়ের বাড়িতে যায়।

খবরটা এনেছিল দিনু মণ্ডল, তার গাঁয়েরই লোক।

জয়চাঁদ তাড়াতাড়ি বড়ো সাহেবকে বলে ছুটি নিয়ে নিল। বুকটা বড়ো দুরদুর করছে। তার ওই একটিই মেয়ে, বড্ড আদরের। মাত্র পাঁচ বছর বয়স। অসুখ হলে তাদের গাঁয়ে বড়ো বিপদের কথা। সেখানে ডাক্তার—বদ্যি নেই, ওষুধপত্র পাওয়া যায় না। ওষুধ বলতে কিছু পাওয়া যায় মুদির দোকানে, তা মুদিই রোগের লক্ষণ শুনে ওষুধ দেয়। তাতেই যা হওয়ার হয়। কাজেই জয়চাঁদের খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।

দুশ্চিন্তার আরও কারণ হল, আজ সকাল থেকেই দুর্যোগ চলছে। যেমন বাতাস তেমনি বৃষ্টি। এই দুর্যোগের দিনে সুন্দরবনের গাঁয়ে পৌঁছোনো খুবই কঠিন ব্যাপার।

দিনু মণ্ডল বলল, পৌঁছোতে পারবে না বলে ধরেই নাও। তবে বাস ধরে যদি ধামাখালি অবধি যাওয়া যায় তাহলে খানিকটা এগিয়ে থাকা হল। সকালবেলায় নদী পেরিয়ে বেলাবেলি গাঁয়ে পৌঁছোনো যাবে।

জয়চাঁদ মাথা নেড়ে বলল, নাঃ, আজই পৌঁছোনোর চেষ্টা করতে হবে। মেয়েটা আমার পথ চেয়ে আছে।

জয়চাঁদ আর দিনু মণ্ডল দুর্যোগ মাথায় করেই বেরিয়ে পড়ল। যাওয়ার পথে একজন ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ঢুকে মেয়ের রোগের লক্ষণ বলে কিছু ওষুধও নিয়ে নিল জয়চাঁদ। এরপর ভগবান ভরসা।

বৃষ্টির মধ্যেই বাস ধরল তারা। তবে এই বৃষ্টিতে গাড়ি মোটে চলতেই চায় না। দু—পা গিয়েই থামে। ইঞ্জিনে জল ঢুকে গাড়ি বন্ধ হয়ে যায় বার বার। যত এসব হয় ততই জয়চাঁদ ধৈর্য হারিয়ে ছটফট করতে থাকে।

যে গাড়ি বিকেল পাঁচটায় ধামাখালি পৌঁছোনোর কথা তা পৌঁছোতে পৌঁছোতে রাত ন—টা বেজে গেল। ঝড়—বৃষ্টি আরও বেড়েছে। ঘাটের দিকে কোনো লোকজনই নেই। তবু ছাতা মাথায় ভিজতে ভিজতে দু—জনে ঘাটে এসে দেখল, নৌকো বা ভটভটির নামগন্ধ নেই। নদীতে বড়ো বড়ো সাঙ্ঘাতিক ঢেউ উঠছে। বাতাসের বেগও প্রচণ্ড। উন্মাদ ছাড়া এই আবহাওয়ায় কেউ নদী পেরোবার কথা কল্পনাও করবে না এখন।

দিনু মণ্ডল বলল, চলো ভায়া, বাজারের কাছে আমার পিসতুতো ভাই থাকে, তার বাড়িতেই আজ রাতটা কাটাই গিয়ে।

জয়চাঁদ রাজি হল না। বলল, তুমি যাও দিনুদাদা, আমি একটু দেখি, যদি কিছু পাওয়া যায়।

পাগল নাকি? আজ নৌকো ছাড়লে উপায় আছে? তিন হাত যেতে—না—যেতে নৌকো উলটে তলিয়ে যাবে।

জয়চাঁদ হতাশ গলায় বলল, ঠিক আছে। তুমি তোমার ভাইয়ের বাড়িতে জিরোও গিয়ে। আমি যদি উপায় করতে না পারি তাহলে একটু বাদে আমিও যাচ্ছি।

দিনু মণ্ডল ফিরে গেল। জয়চাঁদ দাঁড়িয়ে রইল ঘাটে। ছাতা হাওয়ায় উলটে গেছে অনেকক্ষণ। ঘাটে কোনো মাথা গোঁজার জায়গাও তেমন নেই। জয়চাঁদ বৃষ্টি—বাতাস উপেক্ষা করে ঘাটে বসে ভিজতে লাগল। মেয়ের কথা ভেবে কাঁদলও খানিক। কে জানে কেমন আছে মেয়েটা! ভগবানই ভরসা।

কতক্ষণ কেটেছে তা বলতে পারবে না জয়চাঁদ। সময়ের হিসেব তার মাথা থেকে উড়ে গেছে। বসে আছে তো বসেই আছে। ঝড়—বৃষ্টি একসময়ে প্রচণ্ড বেড়ে উঠল। এমন সাঙ্ঘাতিক যে জয়চাঁদ দু—বার বাতাসের ধাক্কায় পড়ে গেল। জলে—কাদায় মাখামাখি হল সর্বাঙ্গ।

সামনে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার নদী। নদীতে শুধু পাঁচ—সাত হাত বড়ো বড়ো ঢেউ উঠছে। সত্যিই এই নদীতে দিশি নৌকো বা ভটভটি চলা অসম্ভব। জয়চাঁদ তবু যে বসে আছে তার কারণ, এই নদীর ওপাশে পৌঁছোলে আরও পাঁচ—সাত মাইল দূরে তার গাঁ। এখান থেকে সে যেন গাঁয়ের গন্ধ পাচ্ছে, মেয়েকে অনুভব করতে পারছে।

গভীরভাবে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটু চমকে উঠল জয়চাঁদ। ভুল দেখল নাকি? অন্ধকারে নদীর সাদাটে বুকে ঢেউয়ের মাথায় একটা ডিঙি নৌকো নেচে উঠল না? চোখ রগড়ে জয়চাঁদ ভালো করে চেয়ে দেখল। দুটো ঢেউ তীর আছড়ে পড়ার পর এবার সে সত্যিই দেখল, একটা ঢেউয়ের মাথায় ছোট্ট একটু ডিঙি নৌকো ভেসে উঠেই আবার তলিয়ে গেল। এ দুর্যোগে কেউ ডিঙি বাইবে এটা অসম্ভব। তবে এমন হতে পারে, ডিঙিটা কোনো ঘাটে বাঁধা ছিল, ঝড়ে দড়ি ছিঁড়ে বেওয়ারিশ হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ জয়চাঁদের মাথায় একটা পাগলামি এল। সে একসময় ভালোই নৌকো বাইত। ডিঙিটা ধরে একবার চেষ্টা করবে? পারবে না ঠিক কথা, কিন্তু এভাবে বসে থাকারও মানে হয় না। ডিঙি নৌকো সহজে ডোবে না। একবার ভেসে পড়তে পারলে কে জানে কী হয়।

জয়চাঁদ তার ঝোলা ব্যাগটা ভালো করে কোমরে বেঁধে নিল। তারপর ঘাটে নেমে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডিঙিটা একটা গোঁত্তা খেয়ে নাগালের মধ্যেই চলে এসেছে প্রায়। জয়চাঁদ ঢেউয়ের ধাক্কায় পিছিয়ে এবং ফের এগিয়ে কোনোরকমে ডিঙিটার কানা ধরে ফেলল। এই ঝড়—জলের সঙ্গে যুদ্ধ করে ডিঙি ধরে রাখা মুশকিল। জয়চাঁদ ডিঙিটাকে টেনে আনল পাড়ে। তারপর অন্ধকার হয়ে যাওয়া চোখে যা দেখল তাতে তার চোখ চড়কগাছ। নৌকোর খোলের মধ্যে জলে একটা লোক পড়ে আছে। সম্ভবত বেঁচে নেই।

জয়চাঁদ বড়ো দুঃখ পেল। লোকটা বোধহয় পেটের দায়েই মাছ—টাছ ধরতে এই ঝড়—জলে বেরিয়েছিল। প্রাণটা গেল। জয়চাঁদ নৌকোটা ঘাটের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে লোকটাকে পাঁজাকোলে তুলে এনে ঘাটের পাথরে উপুড় করে শোয়াল। প্রাণ থাক বা না থাক, বাঁচানোর একটা চেষ্টা তো করা দরকার। সে লোকটার পিঠ বরাবর ঘন ঘন চাপ দিতে লাগল। যাতে পেটের জল বেরিয়ে যায়। সে হাতড়ে হাতড়ে বুঝতে পারল, লোকটা বেশ রোগা, জরাজীর্ণ চেহারা। বোধহয় বুড়ো মানুষ।

খানিকক্ষণ চেষ্টার পর যখন জয়চাঁদ হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল তখন লোকটার গলা দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এল। উঃ বা আঃ গোছের। জয়চাঁদ দ্বিগুণ উৎসাহে লোকটাকে কিছুক্ষণ দলাই—মলাই করল। প্রায় আধঘণ্টা পর লোকটার চেতনা ফিরে এল যেন।

লোকটি বলল, কে বট তুমি?

আমাকে চিনবেন না। গাঙ পেরোবার জন্য দাঁড়িয়েছিলুম, হঠাৎ আপনার ডিঙিটা চোখে পড়ল।

লোকটা উঠে বসল। ঝড়ের বেগটা একটু কমেছে। বৃষ্টির তোড়টাও যেন আগের মতো নয়। লোকটা কোমর থেকে গামছা খুলে চোখ চেপে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল, ওঃ, বড্ড ফাঁড়া গেল আজ। প্রাণে যে বেঁচে আছি সেই ঢের। তা তুমি যাবে কোথা?

জয়চাঁদ হতাশ গলায় বলল, যাব ক্যাওটা গাঁয়ে। ওপার থেকে পাঁচ—সাত মাইল পথ। মেয়েটার বড্ড অসুখ খবর পেয়েই যাচ্ছিলুম। তা সে আর হয়ে উঠল না দেখছি।

লোকটা বলল, হুঁ। কেমন অসুখ?

ভেদবমি হয়েছে শুনেছি। কলেরা কিনা কে জানে। গিয়ে জ্যান্ত দেখতে পাবো কিনা বুঝতে পারছি না।

লোকটা বলল, মেয়েকে বড্ড ভালোবাস, না?

তা বাসি। বড্ডই বাসি। মেয়েটাও বড্ড বাবা—বাবা করে।

লোকটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, চলো তাহলে।

জয়চাঁদ অবক হয়ে বলল, কোথায়?

তোমাকে পৌঁছে দিই।

ক্ষেপেছেন নাকি? কোনোরকমে প্রাণে বেঁচেছেন, এখন নৌকো বাইতে গেলে মারা যাবেন নির্ঘাৎ। আমার মেয়ের যা হওয়ার তা হয়েই গেছে। আর এই দুর্যোগে নদী পেরোনো সম্ভবও নয়।

রোগা লোকটা গামছাটা কোমরে বেঁধে নিয়ে বলল, ওহে, বাঁচা—মরা তো আছেই, সে কি আমাদের হাতে? আমাদের হাতে যা আছে তা হল, চেষ্টা। চলো, নৌকোয় উঠে পড়ো, তারপর ভগবান যা করেন।

লোকটার গলায় স্বরে কী ছিল কে জানে, জয়চাঁদ উঠে পড়ল।

বুড়ো লোকটা নৌকোর খোল থেকে একটা বইঠা তুলে নিয়ে গলুইয়ে বসল। অন্য প্রান্তে জয়চাঁদ। উত্তাল ঢেউয়ে নৌকোটা ঠেলে দিয়ে লোকটা বইঠা মারতে লাগল।

ডিঙিটা একটা ঢেউয়ের মাথায় উঠে পরমুহূর্তেই জলের উপত্যকায় নেমে যাচ্ছিল আবার উঠল, আবার নামল। ওঠা আর নামা। মাঝদরিয়ায় প্রচণ্ড তুফানে উত্তাল ঢেউয়ে ডিঙিটা যেন ওলট—পালট খেতে লাগল। কিন্তু জয়চাঁদ দু—হাতে শক্ত করে নৌকার দুটো ধার চেপে ধরে অবাক চোখে দেখল, জীর্ণ বৃদ্ধ মানুষটা যেন শাল খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে। হাতের বইঠা যেন জলকে তোলপাড় করে সব বাধা ভেঙে নৌকোটাকে তির গতিতে নিয়ে চলেছে।

একটা বিশাল দোতলা সমান ঢেউ তেড়ে আসছিল বাঁদিক থেকে। জয়চাঁদ সেই করাল ঢেউয়ের চেহারা দেখে চোখ বুজে ফেলেছিল।

কে যেন চেঁচিয়ে বলল, জয়চাঁদ, ভয় পেয়ো না।

অবাক হয়ে জয়চাঁদ ভাবল, আমার নাম তো এর জানার কথা নয়!

ঢেউয়ের পর ঢেউ পার হয়ে একসময়ে নৌকোটা ঘাটে এসে লাগল। লোকটা লাফ দিয়ে নেমে ডিঙিটাকে ঘাটের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলে বলল, এ ঘাট চেনো জয়চাঁদ?

জয়চাঁদ অবাক হয়ে অন্ধকারে একটা মস্ত বটগাছের দিকে চেয়ে বলল, কী আশ্চর্য! এ তো আনন্দপুরের ঘাট। এ ঘাট তো আমার গাঁয়ের লাগোয়া! এখানে এত তাড়াতাড়ি কী করে এলাম? নৌকোয় আনন্দপুর আসতে তো সাত—আট ঘণ্টা সময় লাগে।

ঝড়ের দৌলতে আসা গেছে বাবু।

জয়চাঁদ মাথা নেড়ে বলল, না। ঝড় তো উলটোদিকে বইছে।

যাহোক, পৌঁছে তো গেছ।

জয়চাঁদ একটু দ্বিধায় পড়ে হঠাৎ বলল, আপনি কে?

আমি! আমি তো একজন মাঝি। তোমার দয়ায় প্রাণ ফিরে পেয়েছি।

জয়চাঁদের চোখে জল এল। মাথা নেড়ে বলল, আপনাকে প্রাণ ফিরে দিতে পারি তেমন ক্ষমতা আমার নেই। আপনি আসলে কে?

বাড়ি যাও জয়চাঁদ। মেয়েটা তোমার পথ চেয়ে আছে।

জয়চাঁদ চোখের জল মুছে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যেতেই লোকটা পা সরিয়ে নিয়ে বলল, করো কী জয়চাঁদ, করো কী? বাড়ি যাও জয়চাঁদ।

গিয়ে?

মেয়ের কাছে যাও। সে ভালো আছে। অসুখ সেরে গেছে।

জানি মাঝি, আপনি যাকে রক্ষা করেন তাকে মারে কে?

বুড়ো মাঝি একটু হাসল। তারপর উত্তাল ঝড়ের মধ্যে বিশাল গাঙে তার ছোটো ডিঙিটা নিয়ে কোথায় চলে গেল কে জানে।

শারদীয়া ১৪০২

আয়নার মানুষ

শক্তপোক্ত মানুষ হলে কী হয়, গদাধর আসলে বড়ো হা—হয়রান লোক। তিন বিঘে পৈতৃক জমি চাষ করে তার কোনোক্রমে চলে, বাস্তুজমি মোটে বিঘেটাক। তাতে তার বউ শাকপাতা, লাউ—কুমড়ো ফলায়। দুঃখেকষ্টে চলে যাচ্ছিল কোনোক্রমে। কিন্তু পরানবাবুর নজরে পড়েই তার সর্বনাশ।

পরানবাবু ভারি ভুলো মনের মানুষ। জামা পরেন তো ধুতি পরতে ভুলে যান, হাটে পাঠালে মাঠে গিয়ে বসে থাকেন, জ্যাঠামশাইকে 'ছোটোকাকা' ডেকে বিপদে পড়েন। লোকে আদর করে বলে 'পাগলু পরান'। তবে পরানবাবু মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে ফেলেন। একদিন গুরুপদকে বললেন, 'ওরে সাধুচরণ, চারদিকে চোর। খুব চোখ রাখিস বাপু!'

তা সত্যিই সেই রাতে গুরুপদর বাড়িতে চোর ঢুকে বাসনপত্র নিয়ে গেল।

আর একদিন লক্ষ্মীকান্তকে বলে বসলেন, 'রজনীকান্ত যে! তা বিষ্ণুপুরে বেশ ভালো আছ তো ভায়া!'

লক্ষ্মীকান্তর বিষ্ণুপুরে যাওয়ার কথাই নয়, যায়ওনি কোনোদিন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এর কিছুদিনের মধ্যে বিষ্ণুপুরে একটা মাস্টারির চাকরি হয়ে লক্ষ্মীকান্ত চলে গেল। যাওয়ার আগে সবাইকে বলে গেল, 'পরানবাবু ছদ্মবেশী মহাপুরুষ।'

অনেকেরই সে কথা বিশ্বাস হল। গাঁয়ের মাতব্বর শশীভূষণ একবার পরানবাবুর খোঁড়া কুকুর ভুলুকে প্রকাশ্যে 'ল্যাংড়া' বলায় খুব রেগে গিয়ে পরানবাবু বলেছিলেন, 'দেখো নিশিবাবু, সব দিন সমান যায় না। ভুলু যদি ল্যাংড়া হয় তো তুমিও ল্যাংড়া।'

অবাক কাণ্ড হল, দিনসাতেক বাদে শশীবাবু গোয়াল ঘরের চালে লাউডগা কাটতে উঠে একটা সবুজ সাপ দেখে আঁতকে উঠে চাল থেকে পড়ে বাঁ পায়ের গোড়ালি ভাঙেন। মাসটাক তাঁকে নেংচে নেংচে চলতে হয়েছিল।

তা সেই পরানবাবু একদিন গদাধরকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি যেন কে হে! মুখখানা চেনা—চেনা ঠেকছে!'

'আজ্ঞে, আমি গদাধর লস্কর। চেনা না ঠেকে উপায় কী বলুন! এই গাঁয়েই জন্ম—কর্ম, ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছেন। আপনার বাড়ির বাগান পরিষ্কার করতে কতবার গেছি, মনে নেই? পথেঘাটে হরদম দেখাও হচ্ছে।'

খুবই অবাক হয়ে পরানবাবু বললেন, 'বটে! তা তুমি করো কী হে বাপু?'

'আজ্ঞে, এই একটু চাষবাস আছে। তিন বিঘে জমিতে সামান্যই হয়।'

নাক কুঁচকে পরানবাবু বললেন, 'এঃ, মোটে তিন বিঘে! ছ্যাঃ ছ্যাঃ, ও বেচে দাও।'

'বলেন কী বাবু! বেচলে খাব কী?'
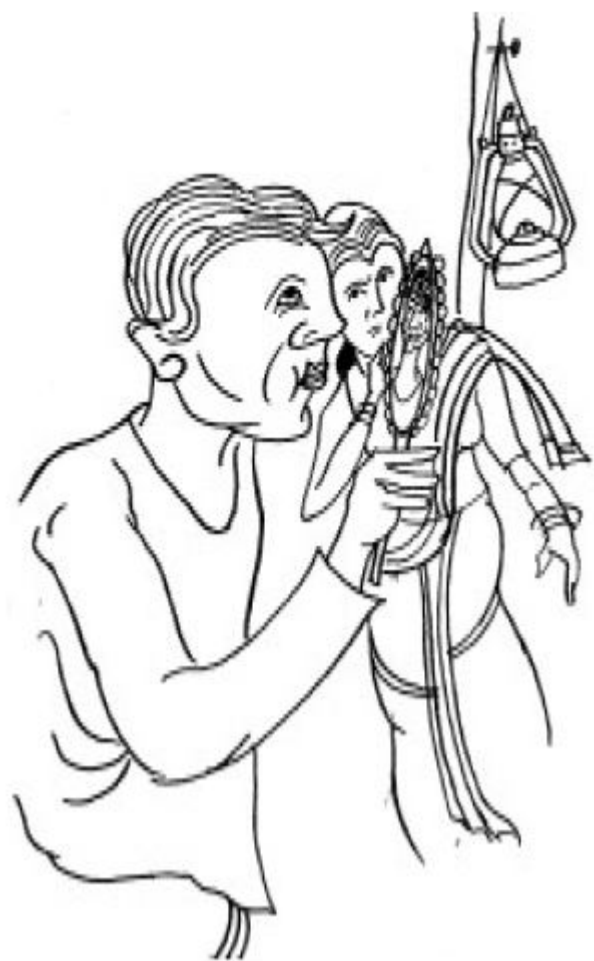
ভারি বিরক্ত হয়ে ভ্রু কুঁচকে পরানবাবু বললেন, 'খাবে? কত খাবে হে হলধর? খেয়ে শেষ করতে পারবে ভেবেছ! হুঁঃ, খাবে!'

কথাটা অনেকের কানে গেল। গাঁয়ের মুরুব্বিরা বললেন, 'ওরে গদাধর, পরান হল বাকসিদ্ধাই। যা বলে, তাই ফলে! ভালোয় ভালোয় জমিজমা বেচে দে বাবা।'

শুনে ভারি দমে গেল গদাধর। শুধু একটা খ্যাপাটে লোকের কথা শুনে এরকম কাজ করাটা কী ঠিক হবে? জমি সামান্য হোক, বছর বছর সামান্য যে ফসলটুকু দেয়, জমি বেচলে যে তাও জুটবে না!

তার বউ ময়না ভারি ধর্মভীরু মেয়ে। ঘরে লক্ষ্মীর পট বসিয়েছে, ষষ্ঠী, শিবরাত্রি ব্রত—উপবাস সব করে। সেও শুনে বলল, 'পরানবাবু কিন্তু সোজা লোক নয়। যা বলে তাই হয়।'

এসব শুনে ভারি ধন্দে পড়ে গেল গদাধর। তার মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি নেই, দূরদর্শিতা নেই, জমি চাষ করা ছাড়া আর কোনো কাজও সে পারে না। একটা পাগল লোকের কথায় ঝুঁকি নেওয়াটা ভারি আহাম্মকি হয়ে যাবে নাকি?

কিন্তু গাঁয়ের পাঁচজনের তাড়নায় আর বউ ময়নার তাগাদায় অবশেষে সে জমি বেচে এক পোঁটলা টাকা পেল। তারপর মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ায় বসে আকাশপাতাল ভাবতে লাগল। এই ক—টা টাকা কয়েক মাসের মধ্যেই ফুরোবে। তারপর কী যে হবে! ভেবে বুক শুকিয়ে গেল তার।

বিপদ কখনো একা আসে না। জমিবেচা কয়েক হাজার টাকা বালিশের নীচে রেখে রাতে ঘুমিয়ে ছিল গদাধর। খাটিয়ে পিটিয়ে মানুষ, ঘুমটা বটে একটু গাঢ়ই হয় তার। কিচ্ছু টের পায়নি। সকালে উঠে বালিশ উলটে দেখল, তলাটা ফাঁকা। দরজার খিলও ভাঙা।

ফের মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ায় বসে পড়ল সে।

থানা—পুলিশ করে কোনো লাভ নেই। থানা পাঁচ মাইল দূর। তার মতো চাষাভুষো থানায় এত্তেলা দিলে কেউ পুঁছবেও না। তার কাছে টাকাটা অনেক বটে, কিন্তু পুলিশ শুনে নাক সিঁটকোবে।

ময়নারও মুখ শুকিয়ে গেছে। সে মোলায়েম গলায় বলল, 'ভেঙে পড়ার কী আছে! আমার লক্ষ্মীর ঘট ভেঙে দু—দিন তো চলুক।'

নুন—ভাত, শাক—ভাত খেয়ে ক—টা দিন কাটল বটে, কিন্তু তারপর আর চলছে না।

ময়না বলল, 'চলো, অন্য গাঁয়ে যাই। দরকার হলে তুমি মুনিষ খাটবে। আমি লোকের বাড়িতে কাজ করব। এ গাঁয়ে ওসব করলে তো বদনাম হবে।'

'বাপ—পিতেমোর গাঁ ছেড়ে যাব?'

'তবে কি মরবে নাকি?'

কাহিল গলায় গদাধর বলল, 'তাই চলো।'

পাছে কেউ দেখতে পায়, সেই ভয়ে সন্ধ্যের পর দু—টি পোঁটলা নিয়ে দু—জন গাঁ ছেড়ে রওনা হল।

গাঁ ছেড়ে বেরোতে—না—বেরোতেই প্রচণ্ড কালবোশেখির ঝড় ধেয়ে এল। আকাশে ঘন বিদ্যুতের চমক, বাজ পড়ার পিলে চমকানো আওয়াজ আর তুমুল হাওয়া। দু—জনে হাত ধরাধরি করে পড়ি কী মরি ছুটতে লাগল। অন্ধকারে পথের মোটে হদিশই পেল না। শুধু টের পাচ্ছিল, হাওয়া তাদের প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। ঝোপ, জঙ্গল, মাঠঘাট পেরিয়ে তারা দিগবিদিকশূন্য হয়ে ছুটছে। বৃষ্টির তোড়ে তাদের জামাকাপড়, পোঁটলা—পুঁটলি ভিজে জবজব করছে। দমসম হয়ে যাচ্ছে তারা। বাতাসের শব্দে আর বাজের আওয়াজে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলারও সুযোগ পাচ্ছে না। হাঁ করলেই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে বাতাস।

কালবোশেখির নিয়ম হল, সে বেশিক্ষণ থাকে না। আধঘণ্টা পরে ঝড় থামল, বৃষ্টি কমল। কিন্তু চারদিক ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কোথাও কোনো আলো দেখা যাচ্ছে না।

দু—জনে একটা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

গদাধর বলল, 'এ কোথায় এলুম!'

ময়না বলল, 'কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। আমার ভয় করছে।'

জমিজমা আর টাকাপয়সা সব হাতছাড়া হওয়ায় গদাধরের আর ভয়ডর নেই। সে ময়নার হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরে বলল, 'আর ভয়টা কীসের?'

ময়না বলল, 'চলো, ফিরে যাই।'

গদাধর একটা শ্বাস ফেলে বলল, 'ফিরব বললেই কী ফেরা যায়? এ কোন জায়গাটায় এসে পড়লুম তাই বা কে জানে? পথঘাট আন্দাজ করা কি সোজা? ঝড়ের ধাক্কায় অনেকটা এসে পড়েছি। চলো, দেখি একখানা গ্রাম—ট্রাম পাওয়া যায় কি না!'

অন্ধকারে ঝোপজঙ্গল ভেঙে তারা ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। গ্রাম বা লোকবসতি পেলেই যে আশ্রয় মিলবে এমন ভরসা নেই। উটকো লোককে কেই বা আদর করে ঘরে জায়গা দেয়? আজকাল যা চোর—ডাকাতের উপদ্রব!

একটা জঙ্গলমতো জায়গা পেরোতেই সামনে একটা আলো দেখতে পেল গদাধর। বলল, 'ওই তো আলো দেখা যাচ্ছে! চলো, দেখা যাক, মাথা গোঁজার জায়গা মেলে কি না!'

সামনে এগিয়ে একখানা মাটকোঠা দেখা গেল বটে, তবে তার বেশ দৈন্যদশা। সামনের ঘরে একখানা হারিকেন জ্বলছে। বন্ধ দরজায় খুটখুট শব্দ করে গদাধর ভারি বিনয়ের গলায় বলল, 'আমরা বড়ো দুঃখী মানুষ। মশাই, একটি মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়া যাবে?'

ভিতর থেকে বাজখাঁই গলায় কে যেন বলে উঠল, 'ভিতরে এসো, দরজা ভেজানো আছে।'

দু—জনে ভারি জড়োসড়ো, ভয়ে ভয়ে ভিতরে ঢুকল। ঘরের কোণে রাখা হারিকেনের আলোয় দেখা গেল, সামনে একটা তক্তপোশ, তাতে গোটানো বিছানা, কয়েকটা বাক্স—প্যাঁটরা, কিছু হাঁড়িকুড়ি। কিন্তু ঘরে কেউ নেই।

গদাধর গলাখাঁকারি দিয়ে ভারি নরম সুরে বলল, 'আজ্ঞে, অপরাধ নেবেন না। উৎপাত করতেই এসেছি বলতে পারেন। তবে বিপদে পড়েই আসা। আমরা বড়ো দুর্দশায় পড়েছি কিনা!'

কে যেন ভরাট গলায় বলে উঠল, 'দুর্দশার তো কিছু দেখছি না হে! কে বলল দুর্দশায় পড়েছ? একটু হাওয়া ছেড়েছিল আর দু—ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছে, এই তো! তা চাষিবাসিকে তো ঝড়ে—জলে কতই কাজ করতে হয়।'

'তা বটে,' বলে গদাধর হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'যদি দয়া করে একটু আশ্রয় দেন তো দাওয়াতে বসেই রাতটা কাটিয়ে দেব'খন।'

'দাওয়ায়! দাওয়ায় কেন হে? দিব্যি ঘরদোর রয়েছে, দাওয়ায় থাকবে কোন দুঃখে? ভিতরের ঘরে যাও, শুকনো কাপড়টাপড় পাবে। পরে নাও গে। উনুনে আঁচ দেওয়া আছে, খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো।'

ময়না ফিসফিস করে বলল, 'গলা পাচ্ছি বটে, কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন বলো তো!'

গদাধরও ভড়কে গিয়ে বলল, 'তাই তো!'

ময়না বলল, 'জিজ্ঞেস করো না!'

গদাধর ফের হাত কচলে বলল, 'আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন আজ্ঞে? সামনে এলে একটু পদধূলি নিতুম।'

'ও বাবা, পদধূলি বড়ো কঠিন জিনিস। খুঁটির গায়ে একটা হাত—আয়না ঝুলছে, দেখতে পাচ্ছ?'

গদাধর ইতিউতি তাকিয়ে দেখল, ভিতরের দরজার পাশে কাঠের খুঁটিতে একটা ছোট্ট হাত—আয়না ঝুলছে বটে।

'আয়নাখানা পেড়ে ওর ভিতরে তাকাও।'

গদাধর অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে আয়নাটা পেড়ে তুলে ধরতেই এমন আঁতকে উঠল যে, একটু হলেই সেটা পড়ে যেত হাত থেকে। আয়নার ভিতরে একখানা সুড়ুঙ্গে লম্বা মুখ। গোঁফ আছে। জুলজুলে চোখ। মাথায় বাবরি চুল। ভয়ের কথা হল, সে মুখের ঠোঁট নড়ছে আর কথা বেরিয়ে আসছে।

দু—জনের ভিরমি খাওয়ার অবস্থা।

আয়নার লোকটা বলল, 'ওরে বাপু, আগে তো প্রাণ রক্ষে হোক, তারপর দাঁতকপাটি লেগে পড়ে থাকলে থেকো।'

ময়না আর গদাধর কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রইল। এর পর ময়নাই প্রথম কথা কয়ে উঠল, 'আমরা বড্ড ভয় পাচ্ছি যে!'

'বলি ভয়টা কীসের, অ্যাঁ! এইজন্যই বলে, লোকের উপকার করতে যাওয়াটাই আহাম্মকি।'

গদাধর সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, ওর ওপর কুপিত হবেন না, আমরা নাহয় ভয়ডর সব গিলে ফেলছি।'

'ভালো। টপ করে ওসব ফালতু জিনিস গিলে পেটে চালান করে দাও। দিয়েছ?'

ময়না আর গদাধর ঘনঘন ঢোক গিলে যেন একটু সামনে নিল। গদাধর বলল, 'নাঃ, এখন আর তেমন বুক ঢিবঢিব করছে না। তোর করছে ময়না?'

'নাঃ। মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছে, এই যা!'

আয়নার লোকটা বলল, 'ওতেই হবে। এখন গিয়ে রান্নার জোগাড়যন্তর করে ফ্যালো।'

গদাধর আমতা—আমতা করে বলল, 'ফস করে অন্দরমহলে ঢুকব? কেউ যদি কিছু বলে?'

লোকটা হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, 'বলার মতো আছেটা কে হে? এই আমি ছাড়া এ বাড়িতে আর জনমনিষ্যি নেই। যাও যাও, ভেজা কাপড়ে বেশিক্ষণ থাকলে নিউমোনিয়া ধরে ফেলবে।'

কথা না বাড়িয়ে তারা ভিতরের ঘরে এসে দেখল, দিব্যি ব্যবস্থা। আলনায় কয়েকখানা পাটভাঙা ডুরে শাড়ি, দুটো ধোয়া ধুতি আর মোটা কাপড়ের কামিজ রয়েছে।

কুয়ো থেকে জল তুলে হাতমুখ ধুয়ে, ভেজা কাপড় বদল করে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, উনুনে আঁচ উঠে গেছে। চালডাল খুঁজতেই বেরিয়ে পড়ল। আলু, লঙ্কা, ফোড়ন, তেল সবই অল্পস্বল্প রয়েছে।

ময়না বলল, 'হ্যাঁ গা, আয়নার জ্যাঠামশাইকে জিজ্ঞেস করো না, উনি আমাদের সঙ্গে খাবেন কি না।'

গদাধর গিয়ে আয়নাটা নিয়ে এল, তারপর সুড়ুঙ্গে মুখখানার দিকে চেয়ে কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, 'আজ্ঞে, আপনি পেরসাদ করে না দিলে কোন মুখে খিচুড়ি খাই বলুন! ময়নার বড়ো ইচ্ছে আপনাকেও একটু ভোগ চড়ায়।'

'না হে বাপু, ওসব আমার সহ্য হয় না। আমার অন্য ব্যবস্থা আছে। তোমরা খাও।'

কী আর করা, অন্যের বাড়িতে ঢুকে এরকম রেঁধেবেড়ে খাচ্ছে বলে ভারি সংকোচ হচ্ছে তাদের। তবে খিদেও পেয়েছে খুব। তাই তারা লজ্জার সঙ্গেই পেটপুরে খেয়ে নিল।

তারপর দু—জনে ক্লান্ত শরীরে আর ভরা পেটে মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর গদাধরের মনে হল, গতকাল ঝড়ে—বৃষ্টিতে পড়ে তার মাথাটাই গুলিয়ে গিয়েছিল। তাই বোধ হয় একটা আজগুবি স্বপ্ন দেখেছে। ময়নাকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করতে ময়না বলল, 'দু—জনে কি একই স্বপ্ন দেখতে পারে?'

'তাহলে ব্যাপারটা কী?'

'তার আমি কী জানি!'

বাইরে কে যেন 'কে আছ হে! কে আছ?' বলে চেঁচাচ্ছিল। গদাধর তাড়াতাড়ি উঠে সদর দরজা খুলে দেখল, নাদুসনুদুস একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। দড়িতে বাঁধা দুটো হালের বলদ, একটা দুধেল গাই, আর—একটা হাল।

লোকটা গম্ভীর হয়ে বলল, 'এই নাও ভাই, ষষ্ঠীপদর গচ্ছিত হাল—গোরু সব বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।'

ধুলোটে কাগজ

নিরাপদর মা মারা যাওয়ার পর তার আর কেউ রইল না। বড্ড একা পড়ে গেল সে। মাকে ভালোবাসতও খুব। মা ছাড়া কেউ ছিল না কিনা! কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে সারাদিন। বাড়িতে মন টিকতে চায় না মোটে। তার ঠাকুরদার আমলের এই বাড়িখানায় পাঁচ—ছ'টা ঘর। সব পুরোনো জিনিসে ঠাসা। পুরোনো আমলের বাক্সপ্যাঁটরা, তোরঙ্গ, কৌটোবাউটো, রাজ্যের ন্যাকড়া—ট্যাকরা, ভাঙা লণ্ঠন থেকে ডালাকুলো সব ডাঁই হয়ে আছে সারা বাড়িতে। মা যক্ষীর মতো এসব আগলে রাখত। কোন কাজে লাগবে কে জানে! কিন্তু নিরাপদ যেদিকেই তাকায় অমনি মায়ের কথা মনে পড়ে, আর বড্ড হু হু করে বুক।

গাঁয়ের বন্ধুরা আর পাড়াপ্রতিবেশীরা অবশ্য তাকে নানা কথাবার্তায় ভুলিয়ে রাখল।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাওয়ার পর গাঁয়ের মহাজন এবং মাতব্বর পশুপতি রায় একদিন গম্ভীরমুখে এসে বললেন, 'ওরে নিরাপদ, বাড়িটার বিলিব্যবস্থা কী করলি? তোর মা যতদিন বেঁচে ছিল কিছু বলিনি। অনাথা বিধবা মানুষ, তার দুঃখ বাড়িয়ে লাভ কী? কিন্তু টাকাগুলো তো আর ফেলে রাখতে পারি না। সুদে—আসলে যে অনেক দাঁড়িয়ে গেছে রে!'

নিরাপদ হাঁ। বলল, 'কীসের টাকা?'

পশুপতি রায় একখানা ধুলোটে কাগজ বের করে দেখাল, 'এই দেখ, তোর বাপের সই। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার। বিশ হাজার টাকা হাওলাত নিয়েছিল বাড়ি আমার কাছে বাঁধা রেখে। সুদে—আসলে দেড় লাখ ছাড়িয়ে গেছে।'

বাবাকে নিরাপদর মনেই নেই। সে যখন ছোটো ছিল, তখন মারা যায়। বাপের সইসাবুদও তার চেনার কথা নয়। কিন্তু পশুপতি ডাকসাইটে মানুষ। তার দাপটে সবাই তটস্থ। পশুপতি রায়ের সুনাম নেই বটে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দটি করার সাহস পায় না।

নিরাপদ মিনমিন করে বলল, 'তা আমাকে কী করতে হবে?'

পশুপতি রায় ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'পিতৃঋণ শোধ করা পুত্রের অবশ্য—কর্তব্য। তা, তুই যদি বাপের ধার এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা শোধ করে দিতে পারিস তাহলে আর ঝামেলায় পড়তে হয় না।'

নিরাপদ ঢোক গিলে বলে, 'টাকা! টাকা কোথায় পাব? আমার তো খাওয়াই জুটছে না।'

'তাহলে তো বাপু বাড়িখানা ছাড়তে হচ্ছে। এই পুরোনো ঝুরঝুরে বাড়ির দাম তিরিশ—চল্লিশ হাজার টাকা ওঠে কি না সন্দেহ। কিন্তু কী আর করা, কিছু টাকা বোকাদণ্ডই যাবে আমার। দু—দিন সময় দিলুম। পরশু দিন সকালে এসে বাড়ির দখল নেব। আর শোন, আমার দুটো পাইক পাহারায় থাকবে। বাড়ির কোনো জিনিস পাচার করা চলবে না। বাড়ি থেকে তো দাম উঠবে না, পুরোনো মাল বেচে যদি আরও কিছু উসুল হয়।'

পশুপতি চলে গেল। কিন্তু দুটো ষণ্ডামার্কা পাইক বাড়ির বারান্দায় লাঠি হাতে বহাল রইল। দু—জনেই ভারি গম্ভীর।

নিরাপদ বুঝে গেল, সে চিপিকলে পড়ে গেছে। পশুপতি রায়ের থাবা থেকে বাড়িটা বাঁচানোর কোনো উপায় নেই। মুচকুন্দপুর গাঁয়ে বা তার আশপাশে এমন কেউ নেই যে পশুপতির সঙ্গে এঁটে উঠবে।

নিরাপদ একটু ভালোমানুষ আর একটু বোকা, আর একটু ভিতুও বটে। তাই সে বসে বসে আকাশপাতাল ভাবতে লাগল। বাড়ি ছাড়তে হলে সে যাবেই বা কোথায়, খাবেই বা কী? মা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন

পশুপতি কেন উদয় হয়নি কে জানে? আর মা থাকতে তার খাওয়াপরারও অভাব ছিল না। মা কীভাবে চালাত তা অবশ্য সে জানে না। কখনো জিজ্ঞেস করারও দরকার হয়নি।

পাইক দু—জন তার দিকে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে আছে দেখে সে ভয় পেয়ে ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিল।

পশুপতিকাকা ঘরের জিনিসপত্র সরাতে বারণ করে যাওয়ায় আরও ফাঁপরে পড়ে গেছে সে। ঘরের চাল—ডালে টান পড়েছে। ভেবেছিল দু—একটা পুরোনো বাসন বেচে দিয়ে চাল—ডাল কিনবে, এখন তো তাও হবে না। নিরাপদ এখন করে কী? কুয়ো থেকে জল তুলে একপেট জল খেয়ে সে ভিতরের দিকের দাওয়ায় বসে রইল চুপ করে। সামনে দেওয়াল—ঘেরা ছোটো উঠোন। দুটো পেঁপে গাছ। একটা আম আর পেয়ারা গাছ। আমগাছে বসে দুটো কাক সমানে ডাকছে। নিরাপদর মাথায় কোনো মতলব আসছে না। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। খিদে পেয়েছে। তবু উঠে দুটো ভাত ফুটিয়ে নেওয়ার গরজও নেই তার। মনটা বড্ড খারাপ।

এমন সময় সদর দরজায় প্রবল কড়া নাড়ার শব্দ শুনে চমকে উঠল সে। তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজা খুলেই দু—পা পিছিয়ে এল নিরাপদ। দুটো মুসকো পাইক রাগে গজরাচ্ছে। প্রথমজন বলল, 'তোর এতবড়ো সাহস যে, তুই পিছন থেকে আমাকে লাথি মেরে পালিয়ে এসেছিস!'

অন্যজন বলল, 'বেয়াদব, নচ্ছার, এত তোর বুকের পাটা যে, পিছন থেকে আমার মাথায় গাঁট্টা মারলি!'

নিরাপদ ভয় পেয়ে তোতলাতে তোতলাতে বলে, 'আ—আমি! কাকুরা কী যা—তা বলছেন? আমি মারব আপনাদের? আমি তো পিছনের দাওয়ায় বসে ছিলাম!'

প্রথম পাইকটা খপ করে তার চুলের মুঠি ধরে বলল, 'অন্যায় করে ফের মিথ্যে কথা! দেব ঘাড়টা মটকে?'

প্রথম পাইকটা দ্বিতীয় পাইকটাকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'দে না আমার হাতে ছেড়ে,গাঁট্টা কাকে বলে আমি ছোঁড়াকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

নিরাপদ জীবনে কারও কাছে মারধর খায়নি। সে ভয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। কিন্তু তাতে ভবি ভোলার নয়। দ্বিতীয় পাইকটা তার ঘাড় ধরে হেঁটমুণ্ডু করে পেল্লায় একটা গাঁট্টা বসিয়ে দিল। নিরাপদর মাথাটা ঝিনঝিন করে উঠল।

এই সময় তাকে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় পাইকটা প্রথম পাইকটার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই বিষ্টু, তুই আমার পিঠে কিল মারলি কেন রে?'

লোকটা অবাক হয়ে বলে, 'আমি কিল মারলাম! বলিস কী? আমি তো তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছি! মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পাস না!'

'মিথ্যে কথা! কিল মেরে ফের ভালোমানুষ সাজা হচ্ছে! বুঝেছি, একটু আগে যখন আমি বারান্দায় বসে গুনগুন করে রামপ্রসাদী গাইতে গাইতে একটু ঢুলে পড়েছিলাম, তখনই তুই গাঁট্টা মেরে গিয়ে ভালোমানুষের মতো তফাতে বসে পড়েছিলি।'

'দেখ পটা, বেশি বাড় ভালো না। জষ্টিমাসে কর্তাবাবুর বাগানের কাঁঠাল চুরি করে খেয়ে আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছিলি, সেকথা আমি ভুলিনি। হিরু পাইকের নাগরা জুতো হারিয়ে ফেলে আমাকে চোর বলে বদনামও তুই—ই তাহলে রটিয়েছিলি! আজ তোকে ছাড়ছি না।'

'দেখ বিষ্টু, লাই দিলে কুকুরও মাথায় চাপতে চায়। তোর বহুত বেয়াদপি এতদিন মুখ বুজে সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। আজ তোর শেষ দেখে ছাড়ব।'

এই বলতে বলতে দু—জনের মধ্যে ধুন্ধুমার লড়াই লেগে গেল। নিরাপদ খিদে—তেষ্টা ভুলে দুই পাইকের লড়াই দেখতে লাগল। মারামারি করতে করতে দু—জনে জড়াজড়ি করে গড়াতে গড়াতে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। হইহই শুনে লোকজন ছুটে এসে ভিড় করে ফেলল। যত লড়াই—ই একসময় শেষ হয়। এটাও হল। আধ ঘণ্টাটাক বাদে ধুলোমাখা দুটো পেল্লাই চেহারার লোকে ছেঁড়া চুল, ফোলা নাক, নড়া দাঁত আর রক্তমাখা ঠোঁটে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে যে যার বাড়ি চলে গেল। নিরাপদর দিকে ফিরেও তাকাল না।

কিন্তু কী নিয়ে দু—জনের মধ্যে ঝগড়াটা লাগল, সেটা নিরাপদ বুঝতেই পারল না। তবে সে মনের আনন্দে রাত্রিবেলা ডাল—ভাত রান্না করে খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোল।

পরদিন সকালেই পশুপতি রায় সদলবলে এসে হাজির। চোখ পাকিয়ে হুংকার ছেড়ে বলল, 'তুই নাকি আমার পাইকদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিস! এত আস্পদ্দা তোর হয় কী করে?'

নিরাপদর একগাল মাছি। সে হাঁ করে কিছুক্ষণ সভয়ে চেয়ে থেকে বলল, 'কর্তাবাবু,আপনার পাইকদের মারধর করার মতো অবস্থাই আমার নয়। আমি তাদের ভয়ে দরজায় খিল এঁটে ছিলাম।'

পশুপতি ফের হুংকার দেয়, 'মিথ্যে কথা! পাঁচজনে দেখেছে, তুই দুটো পাইককে উস্তমফুস্তম করে মেরেছিস। একজনের একটা চোখই বোধ হয় গেছে। পটার দুটো দাঁত পড়ে গেছে। আমি থানায় এত্তেলা

দিয়ে এসেছি, তোকে তারা এসে হাতে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাবে। সাতটি বছর যাতে জেলের ঘানি টানতে হয় তার ব্যবস্থা করে রাখছি।'

নিরাপদ ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেল। মিনমিন করে তবু বলল, 'আজ্ঞে, তারা যে নিজেদের মধ্যেই মারপিট করছিল, নিজের চেখে দেখা।'

'এখন নিজের পিঠ বাঁচাতে গল্প ফাঁদছিস? যাকগে, যা বলার আদালতে দাঁড়িয়ে বলিস। বাঘা উকিলের জেরায় সব কথা বেরিয়ে পড়বে। আজ থেকে চারজন পাইক এ বাড়িতে মোতায়েন থাকবে। গড়বড় দেখলেই লাঠিপেটা করার হুকুম দিয়ে যাচ্ছি।'

এবার আরও বড়ো মাপের চারজন পাইক বহাল হল। তাদের চেহারা দৈত্য—দানবের মতো। তারা বড়ো বড়ো সড়কি আর রামদা হাতে নিয়ে সামনের বারান্দায় এঁটে বসল।

নিরাপদ ফের কাঁপতে কাঁপতে দরজায় খিল তুলে ভিতরের বারান্দায় বসে রইল। কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

একটু বাদেই বাইরের দিকে প্রবল হুটোপাটি আর চেঁচামেচির শব্দ পেয়ে চমকে উঠল সে। দৌড়ে গিয়ে জানলায় উঁকি মেরে যা দেখল, তাতে শরীর হিম হয়ে গেল তার। দেখল, একটা কুড়ি—একুশ বছরের রোগাভোগা চেহারার ছেলে চারজন দৈত্য—দানবের মতো পাইককে দমাদম লাঠিপেটা করছে। পাইকরাও লাঠি, সড়কি, দা চালাচ্ছে বটে, কিন্তু ছেলেটার তাতে কিছুই হচ্ছে না। বরং উলটে ছেলেটার লাঠির ঘায়ে পাইকদের কারও মাথা ফাটছে, কারও কনুই ভাঙছে, কেউ হাঁটু মুড়ে বসে পড়ছে, আর সবাই মিলে আর্ত চিৎকার করছে, 'বাঁচাও, বাঁচাও, মেরে ফেললে, কেটে ফেললে...!'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই লড়াই শেষ। চারটে পাইক চিতপটাং হয়ে পড়ে রইল, সাড়া নেই। ছোকরাটাকে ভারি চেনা চেনা ঠেকল নিরাপদর, কিন্তু ঠিক চিনতে পারল না। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এসে সে বলল, 'তুমি কে ভাই?'

কিন্তু কোথায় কে? ছোকরার চিহ্নমাত্র নেই, শুধু তার পরিত্যক্ত লাঠিটা পড়ে আছে বারান্দায়। লাঠিটা তুলে নিয়ে নিরাপদ হাঁ করে চেয়ে রইল। হঠাৎ শিউরে উঠে সে বুঝতে পারল, ছোকরাটা হুবহু তারই মতো দেখতে। আয়নায় সে নিজের চেহারাটা যেমন দেখেছে, অবিকল সেই চেহারা। তাই অত চেনা চেনা ঠেকছিল বটে!

স্তম্ভিত হয়ে সে যখন দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক সেই সময়ই একটা পুলিশের জিপ এসে বাড়ির সামনে থামল। দারোগাবাবু এবং জনাচারেক সেপাই নেমে এসে থমকে দাঁড়াল। চারজন ভূপতিত পাইক আর তার দিকে পর্যায়ক্রমে চেয়ে দারোগাবাবু বললেন, 'ওঃ, তাহলে যা শুনেছি তা মিথ্যে নয়।'

তাড়াতাড়ি লাঠিটা ফেলে দিয়ে নিরাপদ হাতজোড় করে বলল, 'আজ্ঞে দারোগাবাবু, কোথা থেকে উটকো ছেলে এসে এই কাকুদের খুব মারধোর করে গেছে। আমার কিন্তু কোনো দোষ নেই।'

দারোগাবাবু থমথমে মুখ করে বললেন, 'বটে? তা, ছোকরাটা কে?'

'চিনি না।'

'তুমি না চিনলেও আমরা যে তাকে বিলক্ষণ চিনি হে! তার নাম নিরাপদ সরকার, তাই না?'

নিরাপদ কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'বিশ্বাস করুন দারোগাবাবু, এই পাইক কাকুদের ধারেকাছেও আমি আসিনি। আমি দরজায় খিল দিয়ে ...'

দারোগা হাত তুলে বললেন, 'আর বলতে হবে না। এবার আমার সঙ্গেলক্ষ্মী ছেলের মতো থানায় চলো তো। তোমাকে অবশ্য বিশ্বাস নেই। আমাদের ওপরেও হামলা করতে পারো। তাই আগেই সাবধান করে দিচ্ছি। বেগড়বাঁই দেখলে কিন্তু গুলি চালিয়ে দেব।'

অগত্যা থানাতেই যেতে হল নিরাপদকে।

থানায় একজন মস্ত গোঁফওয়ালা হোমরাচোমরা গোছের লোক বসে ছিলেন। চোখে ভ্রুকুটি, আর খুব রাশিভারি মুখ। দারোগাবাবু তাঁকে দেখেই লম্বা স্যালুট দিয়ে বললেন, 'স্যার, আপনি এখানে?'

'হ্যাঁ, আমি। ফোনে বড়োকর্তার জরুরি হুকুম পেয়ে আসতে হল। তা, এই ছেলেটা কে? ধরেই বা এনেছেন কেন?'

দারোগাবাবু তখন সবিস্তার নিরাপদর গুন্ডামির কথা বলে গেলেন। শুনে রাশিভারি লোকটা আপাদমস্তক নিরাপদকে একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বয়স কত?'

ভয়ে নিরাপদর গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'আজ্ঞে, কুড়ি—একুশ হবে।'

'বলি, পুলিশে চাকরি করবে?'

নিরাপদ ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে গোলমেলে মাথা নিয়ে চুপ করে রইল। ভুলই শুনে থাকবে। সে আজকাল ভুল শুনছে। ভুল দেখছেও।

রাশভারি লোকটা বলল, 'পুলিশে আজকাল ডাকাবুকো লোকের খুব অভাব। আমরা তোমার মতো বাহাদুর ছেলেই চাই। দেরি নয়, আজকেই জয়েন করো। আজই সদরে গিয়ে তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

সবাই এমন হাঁ করে রইল যে, সুচ পড়লে শোনা যায়।

পরদিন সকালেই পশুপতি রায় এসে হাজির। গোঁফ ঝুলে গেছে। চোখে করুণ দৃষ্টি। জোড়হাতে বলল, 'বাবা নিরাপদ, এবারের মতো মাপ করে দে বাপ। জালিয়াতির দায়ে যদি জেল খাটাস, তাহলে এই বুড়ো বয়সে কি বাঁচব? মাপ করে দে বাপ। এই তোর বাপের ধারের কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছি!'

নিরাপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'লে হালুয়া!'

২ মে ২০০৫

দুখীরাম

এই ষষ্ঠীগাঁয়ে কী ভূতের অভাব ছিল রে বাপু! গাছে গাছে ভূত ঝুলে থাকত। ঘরের চালে যেমন লাউ কুমড়ো ফলে থাকে তেমনি ভূত ফলে থাকত। দিব্যি পুরুষ্টু পুরুষ্টু ভূত, নধরকান্তি চেহারা।

বলেন কী মহাই? ভূত বেশি হৃষ্টপুষ্ট হওয়া কি ভালো! তাতে কি ভূতের মহিমা থাকে?

কেন বাপু, পুরুষ্টু বলে ভূতের মহিমা টসকাচ্ছে কীসে?

দূর মহাই, রস কষ শুকিয়ে চিমসে না মারলে কী ভূত হওয়া যায়? নাকি সেই ভূতকে কেউ সমীহ করে? না মহাই, আপনার ভূত একেবারেই অচল মাল। তা আপনার সেই নধরকান্তি ভূতেরা গেল কোথায়? এই গাঁয়ে এসে অবধি একটা ভূতের আঁশও শুকলুম না।

সেই দুঃখের কথাই তো বলছি রে বাপু। ধৈর্য হারালে কী চলে?

ষষ্ঠীগাঁয়ের আটচালাকে চণ্ডীমণ্ডপও বলা যায়। পুজোর সময়ে পুজোটুজোও হয়। আর সারাবছর এটাই হল গাঁয়ের মাতব্বরদের গুলতানির জায়গা।

দুখীরাম হুঁকোয় তামাক খেতে খেতে বলে, নষ্টের মূল হল ওই ভজা বোষ্টম। যেবার নবদ্বীপে গিয়ে মন্তর নিয়ে এল, তারপর খোল করতাল নিয়ে হরি সংকীর্তনে নেমে পড়ল, উদ্দণ্ড কেত্তন কচ্চেচ। তাতে মানুষেরই পালাই—পালাই অবস্থা তো ভূত কোন ছার। ওই কেত্তনের তাড়া খেয়েই ভূতেরা সেই যে গা—ঢাকা দিয়েছে, আর তাদের টিকিটিও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আপনার একটা দোষ কী জানেন দুখুবাবু? আপনি সব কিছুতেই বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেন।

কেন বাপু, বাড়াবাড়ির কী দেখলে বলো তো?

এই তো সেদিন বলছিলেন ষষ্ঠীগাঁয়ের মতো এত উৎকৃষ্ট চোর নাকি ভূভারতে নেই। এখানকার চোরেরা নাকি সব ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিধারী চোর। চুরিবিদ্যেয় পিএইচ ডি। তারা নাকি হাসতে হাসতে হাঁস মুরগির তলা থেকে ডিম চুরি করতে পারে, সূক্ষ্ম দেহে ব্যাঙ্কের ভল্টে ঢুকে যায়, জমিদার নীলকান্তবাবু যখন ছাদে পায়চারি করছিলেন তখন নাকি চিতে চোর তাঁর পা থেকে হরিণের চামড়ার চটিজোড়া সরিয়ে ফেলেছিল, তিনি টেরও পাননি। তারপর এও বলেছিলেন বোষ্টমপুকুরে নাকি জাহাজর মতো বড়ো বড়ো মাছ ছিল, যার একটা কেটে রান্না করে সাত গাঁয়ের সাতশো লোককে ভোজ খাওয়ানো হয়েছিল, বলেননি?

দুখীরাম মিটমিট করে চেয়ে বললেন, বলেছি বই কী! তা সত্যিকথা বলব তাতে দোষের কী বাপু? চোরও ছিল, মাছও ছিল। তবে কিনা কানাই দারোগা এসে অবধি চোরদের ভারি দুরবস্থা কিনা, তারা সব হাজতে। আর মাছের আর দোষ কী বলো, মাছশিকারি নন্দবাবু রিটায়ার করে গাঁয়ে ফিরে আসায় আমাদের কপাল পুড়েছে।

লোকে কিন্তু অন্য কথা বলে।

আহা, লেকের কথায় তোমার কান দেওয়ার দরকার কী বাপু? তা তারা বলে কী?

তারা বলে, দুখীরামবাবু গুলবাজ।

বলে নাকি?

বলেই তো! এ গাঁয়ে ভূত নাকি বড়ো একটা দেখা যায় না, চোর—ছ্যাঁচড় আছে তা সব জায়গায় যেমন থাকে, আর বোষ্টমপুকুরে নাকি চ্যাং মাছ ছাড়া আর কোনো মাছই নেই।

দুখীরাম খুব গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ মন দিয়ে তামাক খেয়ে বললেন, বটে?

হ্যাঁ।

তুমি কি তাদের কথাই বিশ্বাস করো?

করি। আপনাকে আমার গুলবাজ বলেই মনে হয়।

আহা, তা নাহয় হল, তা বলে সব কথাই উড়িয়ে দেওয়াটা ভালো অভ্যেস নয়। বুঝেছ?

আমার আর বুঝে দরকার নেই মহাই। এখন একটু ঝেড়ে কাশুন তো! পাতিরাম কানুনগোর প্রতিষ্ঠিত তিনশো বছরের পুরোনো কালীমন্দিরটা কোথায়? লোকে বলে মন্দিরটার কথা শোনা যায়, কিন্তু কেউ কখনো দেখেনি।

লোকে সব কথাই তো আর ভুল বলে না। এটা ঠিক কথাই কানুনগোর কালীমন্দির আজ অবধি কেউ দেখেনি, শুধু একজন ছাড়া।

সেই লোক কি আপনি নাকি?

তা যদি আমিই হই তাতে কি দোষের কিছু আছে?

না মহাই, দোষের আর কী থাকবে! তবে কিনা কথাটা বিশ্বাস হবে না। এই আর কী!

বুঝেছি বাপু, গাঁয়ের লোক তোমার মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছে। এখন যা—ই বলি তা—ই তোমার কাছে গুলগল্প হয়ে দাঁড়াবে।

আচ্ছা মহাই, আপনার তো বেশ বয়স হল। আমাদের মতো ছেলেছোকরা নন! তা এই ষাট পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ওইসব গুলগল্প করেন কী করে?

কেন বাপু, বয়সের সঙ্গে গল্পের কোথাও আড়াআড়ি আছে নাকি?

তা তো আছেই। গুল মানে মিথ্যে কথা। আর মিথ্যে কথা পাপ।

ওই দেখ, এর মধ্যে পাপ—পুণ্যি এনে ফেলা কি ভালো হল বাপু! তবে তোমার ঘাবড়ানোর দরকার নেই। কানুনগোর কালীমন্দির আমিও দেখিনি। দেখেছে পার্শ্বনাথ।

তিনি আবার কে?

খুঁজে নাও গে যাও।

আরে মহাই, রাগ করলেন নাকি? আপনাকে গুলবাজ বললেও গাঁয়ের লোকেরা কিন্তু স্বীকার করে যে, এই গাঁয়ের সব ইতিহাস একমাত্র আপনিই জানেন। গত ছয় মাস এই গাঁয়ে ভগ্নীপোতের বাড়িতে পড়ে আছি, আজ অবধি গাঁয়ের কাউকে চিনতে বাকি নেই, কিন্তু এই পার্শ্বনাথটা কে তা তো বুঝতে পারছি না। ও নামে কি সত্যিই কেউ আছে?

অনেকক্ষণ নিমীলিত চোখে তামাক খাওয়ার পর দুখীরাম হঠাৎ বলে উঠলেন, ছিল।

তার মানে?

তার মানে, এখন নেই।

হেঁয়ালি করছেন নাকি দুখীরামবাবু?

না হে বাপু, হেঁয়ালি জন্মে করিনি। এই পার্শ্বনাথের কথাই বলছিলুম হে। পার্শ্বনাথ একজন ছিল। তবে এখন নেই।

তা তিনি গেলেন কোথায়?

কাছেপিঠেই আছে। রথতলার মাঠটা তো চেনো, তার পাশেই বাঁশবন। তার পেছনেই খাঁড়া মুৎসুদ্দির পোড়ো বাড়ি, সেখানেই।

পোড়ো বাড়ি বলছেন, সেখানে লোক থাকবে কী করে?

তোমাকে কি বলেছি যে ওখানে লোক থাকে? থাকে তো পার্শ্বনাথ আর তার কিছু স্যাঙাৎ।

পার্শ্বনাথ কি তবে লোক নন?

পরলোক বলতে পারো, লোক বলি কোন সুবাদে?

এই তো ফের গোলমাল পাকালেন। ভূতপ্রেত এনে ফেললে কাজের কথা এগোয় কী করে বলুন তো? কানুনগো কালীবাড়ির কথা যা শুনেছি তা এক ঐতিহাসিক জিনিস। এই গাঁয়েই কোথাও তার ধ্বংসস্তূপ থাকার কথা। এখন কি ভূতপ্রেত ধরে সেখানে যেতে হবে নাকি?

তুমি কি নাস্তিক?

কেন মহাই, নাস্তিক হলে দোষ কী? কতবড়ো মানুষই তো নাস্তিক।

তুমি কি বড়ো মানুষ?

আজ্ঞে না।

তাহলে? বড়োমানুষের মেলা টাকাপয়সা, লোকলস্কর, নামডাক, প্রতিপত্তি থাকে বলে নাস্তিক হলেও মানিয়ে যায়। গরিবগুর্বোদের কী নাস্তিক হলে চলে বাপু?

বুঝলাম। তা না হয় আমাকে একরকম আস্তিক বলেই ধরে নিন। তাতে যদি একটু সুবিধে হয়।

তুমি তো দেখছি কানুনগো কালীবাড়ির জন্য বড্ড হন্যে হয়ে পড়েছ বাপু! ব্যাপার কী বলো তো? গুপ্তধন —টনের খবর আছে নাকি?

আজ্ঞে না। কী যে বলেন! গুপ্তধনের খবর থাকলে কি আর পাঁচকান করতুম। শুনেছিলুম কালী নাকি বড্ড জাগ্রত!

তা আর বলতে। ঠিকই শুনেছ বাপু! জাগ্রত কী বলছ, একেবারে জ্যান্ত কালী। অমাবস্যার রাতে কতজনা দেখেছে মা হাতে খাঁড়া নিয়ে লকলকে জিব বের করে গাঁয়ের রাস্তায় রাস্তায় রোদে বেরিয়ে পড়েছেন। ওঃ, সে এক দিন গেছে!

আপনিই দেখেছেন বুঝি?

বললেই তো বলবে গুলবাজ। না বাপু, আমি আর ওসব বলতে যাচ্ছি না। তা তুমি কালীমন্দিরটা খুঁজছ কেন বাপু? মতলবটা কী?

কৌতূহল বলতে পারেন। আমার পুরো নামটা কি আপনি জানেন?

না বাপু, আমি তোমার আধখানা নাম জানি। হারু। লোকে তো ওই বলেই ডাকে কিনা। তা তোমার বুঝি একটা জম্পেশ নামও আছে?

যে আজ্ঞে। নামটা হল হারাধন দাস কানুনগো।

কানুনগো! এই তো মুশকিলে ফেলে দিলে হে! কানুনগো মানে কী? তুমি কি বলতে চাও তুমি কানুনগোদের বংশধর? এই ষষ্ঠীগাঁয়েরই লোক?

যে আজ্ঞে।

দেখ কেলেঙ্কারি! এসব আগে বলতে হয়।

আজ্ঞে, আমার বাবা হলেন বিশ্বনাথ কানুনগো, ঠাকুরদা হরনাথ, তস্য পিতা অম্বরনাথ, তস্য পিতা বিদ্যাপতি, তস্য পিতা ডমরুনাথ, তস্য পিতা পরেশনাথ, তস্য—

বাপ রে! তুমি তো বাহাদুর ছেলে! সাত পুরুষের নাম অবধি মনে রেখেছ! আজকালকার ছেলেছোকরাদের তো ঠাকুরদার নাম জিজ্ঞেস করলেও মাথা চুলকোতে থাকে। তোমার বাবা বিশ্বনাথ আর আমি একেবারে সেই ন্যাংটাবেলার বন্ধু। তবে কিনা বিশু ছিল ভারি ভালো ছেলে, আর আমি ত্যাঁদড়।

তা আপনি এখনও একটু আছেন। তা পার্শ্বনাথের কথা কী এবার একটু বলবেন।

বলব বই কী বাবা, অবশ্যই বলব, তবে বললে কি তোমার বিশ্বাস হবে?

বলেই দেখুন না।

এই যদি ধরো বলি, এই আমিই পার্শ্বনাথ?

অ্যাঁ!

বিশ্বাস হল না তো! নাস্তিকদের তো ওইটেই অসুবিধে কিনা। বিশ্বাসযোগ্য কথা হলেও বিশ্বাস করতে চায় না। তবে বলি বাপু, কানুনগো কালীমন্দির হাটখোলার পিছনে শাপলা বনের মাঝখানে। একটা উঁচুমতো ঢিবি দেখতে পাবে। সেটা খুঁড়লেই বেরিয়ে পড়বে।

বলেই হঠাৎ হুঁকো—টুকো সমেত দুখীরাম বাতাসে গায়েব হয়ে গেল।

হারু হাঁ।

কালীচরণের ভিটে

কালীচরণ লোকটা একটু খ্যাপা গোছের। কখন যে কী করে বসবে, তার কোনো ঠিক নেই। কখনো সে জাহাজ কিনতে ছোটে, কখনো আদার ব্যবসায় নেমে পড়ে। আবার আদার ব্যবসা ছেড়ে কাঁচকলার কারবারে নেমে পড়তেও তার দ্বিধা হয় না। লোকে বলে, কালীচরণের মাথায় ভূত আছে। সেকথা অবশ্য তার বউও বলে। রাত তিনটের সময় যদি কালীচরণের পোলাও খাওয়ার ইচ্ছে হয় তো, তা সে খাবেই।

তা, সেই কালীচরণের একবার বাই চাপল, শহরের ধুলো—ধোঁয়া ছেড়ে দেশের বাড়িতে প্রাকৃতিক পরিবেশে গিয়ে বসবাস করবে। শহরের পরিবেশ ক্রমে দূষিত হয়ে যাচ্ছে বলে রোজ খবরের কাগজে লেখা হচ্ছে। কলেরা, ম্যালেরিয়া, জন্ডিস, যক্ষ্মা— শহরে কী নেই!

কিন্তু কালীচরণের এই দেশে গিয়ে বসবাসের প্রস্তাবে সবাই শিউরে উঠল। কারণ, যে গ্রামে কালীচরণের আদি পুরুষরা বাস করত, তা একরকম হেজেমজে গেছে। দু—চারঘর নাচার চাষাভুষো বাস করে। কালীচরণদের বাড়ি বলতে যা ছিল, তাও ভেঙেচুরে জঙ্গলে ঢেকে ধীরে ধীরে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সেই বাড়িতে গত পঞ্চাশ বছর কেউ বাস করেনি, সাপখোপ, ইঁদুর—ছুঁচো, চামচিকে প্যাঁচা ছাড়া।

কিন্তু কালীচরণের গোঁ সাঙ্ঘাতিক। সে যাবেই।

তার বউ বলল, 'থাকতে হয় তুমি একা থাক গে। আমরা যাব না।'

বড়োছেলে মাথা নেড়ে বলল, 'গ্রাম! ও বাবা, গ্রাম খুব বিশ্রী জায়গা।'

মেয়েও চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, 'গ্রামে কি মানুষ থাকে?'

ছোটোছেলে আর মেয়েও রাজি হল না।

রেগেমেগে কালীচরণ একাই তার স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়ল। বলে গেল, 'আজ থেকে আমি তোমাদের পরস্য পর। আর ফিরছি না।'

কালীচরণ যখন গাঁয়ে পৌঁছোল, তখন দুপুরবেলা। গ্রীষ্মকাল। স্টেশন থেকে রোদ মাথায় করে মাইলটাক হেঁটে সে গ্রামের চৌহদ্দিতে পৌঁছে গেল। লোকজন প্রায় দেখাই যায় না। চারদিক খাঁ—খাঁ করছে।

গোঁয়ার কালীচরণ নিজের ভিটের অবস্থা দেখে বুঝল যে, এ ভিটেয় আপাতত বাস করা অসম্ভব। চারদিকে নিশ্ছিদ্র জঙ্গলে বাড়িটা ঘেরা। আর বাড়ি বললেও বিশেষ কিছু আর খাড়া নেই। তবু হার মানলে তো আর চলবে না।

একটা জিনিস এখনও বেশ ভালোই আছে। সেটা হল তাদের বাড়ির পুকুরটা। জল বেশ পরিষ্কার টলটলে, বাঁধানো ঘাট ভেঙে গেলেও ব্যবহার করা চলে। কালীচরণ পুকুরে নেমে হাতমুখ ভালো করে ধুয়ে নিল, ঘাড়ে মাথায় জল চাপড়াল। পুকুরের জলে চিঁড়ে ভিজিয়ে একডেলা গুড় দিয়ে খেল। তারপর পুকুরপাড়ে কদমগাছের তলায় বসল জিরোতে।

একটু ঢুলুনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা পাখির ডাকে চটকা ভেঙে চাইতেই সে সোজা হয়ে বসল। তাই তো! চারদিকে জঙ্গলে ঢাকা হলেও উত্তর দিকটায় জঙ্গলের মধ্যে একটা সুঁড়ি পথ আছে যেন! মনে হয় লোকজনের যাতায়াত আছে। তাদের বাগানে অনেক ফলগাছ ছিল। হয়তো এখনও সেসব গাছে ফল ধরে, আর রাখাল ছেলেটেলে সেইসব ফল পাড়তে ভেতরে যায়। তাই ওই পথ।

কালীচরণ বাক্স হাতে উঠে পড়ল। তারপর কোলকুঁজো হয়ে বহুকালের পরিত্যক্ত ভিটের মধ্যে গুঁড়ি মেরে সেঁধোতে লাগল।

ভেতরে এসে স্তূপাকার ইট আর ভগ্নস্তূপের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল কালীচরণ। তারপর হাঁ করে দেখতে লাগল চারদিকে।

অবস্থা যাকে বলে গুরুচরণ। একখানা ঘরও আস্ত মনে হচ্ছিল না। এর মধ্যে কোথায় যে রাত্রিবাস করবে সেইটেই হল কথা। কালীচরণের সঙ্গে টর্চ, হারিকেন, লাঠি আছে। ছোটো একটা বিছানাও এনেছে সে। রাতটা কাটিয়ে কাল থেকে লোক লাগিয়ে দিলে দিন—সাতেকের মধ্যে জঙ্গল আর আবর্জনা সাফ হয়ে যাবে। রাজমিস্ত্রি ডেকে একটু—আধটু মেরামত করাবে। ভালোই হবে।

কালীচরণ ঘুরে—ঘুরে বাড়িটা দেখতে লাগল। দক্ষিণ দিকে নীচের তলায় একখানা ঘর এখনও আস্ত বলেই মনে হল কালীচরণের। স্তূপাকার ইট আর আবর্জনার ওপর সাবধানে পা ফেলে কালীচরণ এগিয়ে গেল।

বেজায় ধুলো, চামচিকের নাদি, আগাছা সত্ত্বেও ঘরখানা আস্ত ঘরই বটে। মাথার ওপর ছাদ আছে, চারদিকে দেওয়াল আছে। জানলা কপাট অবশ্য নেই। একটু সাফসুতরো করে নিলেই থাকা যায়। দরকার একখানা ঝাঁটার।

তা ঝাঁটাও পাওয়া গেল খুঁজতেই। কোণের দিকে পুরোনো একগাছা ঝাঁটা দাঁড় করানো। পাশে একটা কোদাল। তাও বেশ পুরোনো। বোধহয় সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার।

কালীচরণ ঘণ্টাখানেকের মেহনতেই ঘরখানা বেশ সাফ করে ফেলল। গা তেমন ঘামলও না। তারপর ঘরখানার ছিরি দেখে মনে হল, এক বালতি জল হলে হত। কিন্তু বালতি!

না, কপালটা ভালোই বলতে হবে। ঘর থেকে বেরোতেই ভাঙা সিঁড়ির নীচে চোখ পড়ল তার দু—খানা জংধরা বালতি উপুড় করা রয়েছে। কালীচরণ যেমন অবাক, তেমনি খুশি হল— যখন দেখল, একটা বালতিতে লম্বা দড়ি লাগানো রয়েছে।

উঠোনের পাতকুয়োটা হেজেমজে যাওয়ার কথা এতদিনে। কিন্তু কপালটা ভালোই কালীচরণের। মজেনি। সে জল তুলে এনে ঘরটা ভালো করে পরিষ্কার করল। তারপর ভাবল, একটা চৌকিটৌকি যদি পাওয়া যেত তো তোফা হত। আর একটা জলের কলসি।

বলতে নেই, কালীচরণের মনে যা আসছে তাই হয়ে যাচ্ছে আজ। কলসি পাওয়া গেল পাশের ঘরটায়, মুখটা সরা দিয়ে ভালো করে ঢাকা ছিল বলে ভেতরটা এখনও পরিষ্কার। একটু মেজে নিলেই হবে। আর

চৌকি নয়, খাটই পাওয়া গেল কোণের দিককার ঘরে। ভাঙা নয় আস্ত খাট। কালীচরণ খাটখানা খুলে আলাদা—আলাদা অংশ বয়ে নিয়ে এসে পেতে ফেলল।

চমৎকার ব্যবস্থা।

সন্ধ্যে হয়ে আসতেই কালীচরণ হারিকেন জ্বেলে ফেলল। চিঁড়ে খেয়েই রাতটা কাটাবে ভেবেছিল। কিন্তু সন্ধ্যে হতেই প্রাণটা ভাতের জন্য আঁকুপাকু করছে। চাল, ডাল, আলু, নুন, তেল, সব সঙ্গে আছে। কিন্তু উনুন, কয়লা, কাঠ এসব জুটবে কোত্থেকে?

ভাবতে—ভাবতে কালীচরণ উঠল। সবই যখন জুটেছে, তখন এও বা জুটবে না কেন?

বাস্তবিকই তাই, ভেতরের বারান্দার শেষ মাথায় যেখানে রান্নাঘর ছিল, সেখানে এখনও একখানা উনুন অক্ষত রয়েছে। ঘরের কোণে কিছু কাঠ, মন দুয়েক কয়লা পড়ে আছে। আর আশ্চর্য, রান্নাঘরে যে বড়ো কাঠের বাক্স ছিল সেটা তো আছেই, তার মধ্যে কিছু বাসন—কোসনও রয়ে গেছে।

কালীচরণ দাঁত বের করে হাসল। তারপর গুনগুন করে রামপ্রসাদী গাইতে—গাইতে রান্না চড়িয়ে দিল। গরম—গরম ডাল—ভাত আর আলুসেদ্ধ ভরপেট খেয়ে ঘুমে রাত কাবার করে দিল কালীচরণ।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে বাইরে আসতেই তার মনে হল, বাড়িটা যেন ততটা ভাঙা আর নোংরা লাগছে না। ধ্বংসস্তূপটা যেন খানিক কমে গেছে, নাকি তার চোখের ভুল!

যাই হোক, কালীচরণ কিছু জঙ্গল পরিষ্কার করল। ভাবল, নিজেই করে ফেলবে, লোক লাগানোর দরকার নেই।

দুপুরবেলা কালীচরণ পুরোনো বাগান খুঁজে কিছু উচ্ছে, কাঁকরোল, ঝিঙে, পটল আর কুমড়ো পেয়ে গেল। দিব্যি ফলে আছে গাছে। পাকা আমও রয়েছে। সুতরাং দুপুরে কালীচরণ প্রায় ভোজ খেয়ে উঠল আজ। তারপর ঘুম।

বিকেলে চারদিক ঘুরে দেখে সে খুশিই হল। অনেকটা জঙ্গল সে নিজে সাফ করে ফেলেছিল। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, আরও অনেক বেশি আপনা থেকেই সাফ হয়ে গেছে। আবর্জনার স্তূপ প্রায় নেই বললেই হয়। আশ্চর্যের কথা, বাড়িতে আরও কয়েকটা আস্ত ঘর খুঁজে পাওয়া গেল। সেসব ঘরের জানলা দরজাও অটুট। সুতরাং কালীচরণ খুব খুশি। এইরকমই চাই।

তবে সবটা এইরকমই আপনা—আপনি হয়ে উঠলে ভারি লজ্জার কথা। তাই পরদিন কালীচরণ বাজার থেকে গোরুর গাড়িতে করে কিছু চুন—সুরকি, ইট আর কাঠ নিয়ে এল। যন্ত্রপাতি বাড়িতেই পেয়ে গেছে সে, টুকটুক করে বাড়িটা সারাতে শুরু করল।

মজা হল, বেশি কিছু তাকে করতে হল না। সে যদি খানিকটা দেয়াল গাঁথে আরও খানিকটা আপনি গাঁথা হয়ে যায়। সে এক দেয়ালের কলি ফেরালে, আরও চারটে দেয়ালের কলি আপনা থেকেই ফেরানো হয়ে যায়।

সুতরাং দেখ—না—দেখ কালীচরণের আদি ভিটের ওপর বাগানওয়ালা পুরোনো বাড়িটা আবার দিব্যি হেসে উঠল। যে দেখে, সে—ই অবাক হয়।

কিন্তু মুশকিল হল, এতবড়ো বাড়িতে কালীচরণ একা। সারাদিন কথা বলার লোক নেই।

কালীচরণ তাই গ্রাম থেকে গরিব বুড়ো একজন মানুষকে চাকর রাখল। বাগান দেখবে, জল তুলবে, কাপড় কাচবে, রান্না করবে। কালীচরণও কথা কইতে পেয়ে বাঁচবে।

লোকটা দিন—দুই পর একদিন রাতে ভয় খেয়ে ভীষণ চেঁচামেচি করতে লাগল। সে নাকি ভূত দেখেছে।

কালীচরণ খুব হাসল কাণ্ড দেখে। বলল, 'দূর বোকা, কোথায় ভূত?'

কিন্তু লোকটা পরদিন সকালেই বিদেয় হয়ে গেল। বলল, 'সারাদিন জল খেয়ে থাকলেও এ বাড়িতে আর নয়।'

কালীচরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাত্র। কিছুদিন আবার একা। কিন্তু কাঁহাতক ভালো লাগে। অগত্যা কালীচরণ একদিন শহরে গিয়ে নিজের বউকে বলল, 'একবার চলো দেখে আসবে। সে বাড়ি দেখলে তোমার আর আসতে ইচ্ছে হবে না।'

কালীচরণের বউয়ের কৌতূহল হল। বলল, 'ঠিক আছে চলো। একবার নিজের চোখে দেখে আসি কোন তাজমহল বানিয়েছ।'

গাঁয়ে এসে বাড়ির শ্রীচাঁদ দেখে কিন্তু বউ ভারি খুশি। ছেলে—মেয়েদেরও আনন্দ ধরে না।

কিন্তু পয়লা রাত্তিরেই বিপত্তি বাধল। রাত বারোটায় বড়োমেয়ে ভূত দেখে চেঁচাল। রাত একটায় ছোটোমেয়ে ভূতের দেখা পেয়ে মূর্ছা গেল। রাত দুটোয় দুই ছেলে কেঁদে উঠল ভূত দেখে। রাত তিনটেয় কালীচরণের বউয়ের দাঁতকপাটি লাগল ভূত দেখে।

পরদিন সকালেই সব ফরসা। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে শহরে রওনা হওয়ার আগে বউ বলে গেল, 'আর কখনো এ বাড়ির ছায়া মাড়াচ্ছি না।'

কালীচরণ আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আপনমনে বলল, 'কোথায় যে ভূত, কীসের যে ভূত, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

গুপ্তধন

ভূতনাথবাবু অনেক ধারদেনা করে, কষ্টে জমানো যা—কিছু টাকাপয়সা ছিল সব দিয়ে যে পুরোনো বাড়িখানা কিনলেন তা তাঁর বাড়ির কারও পছন্দ হল না। পছন্দ হওয়ার মতো বাড়িও নয়, তিন—চারখানা ঘর আছে বটে কিন্তু সেগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। দেয়ালে শ্যাওলা, অশ্বত্থের চারা গজাচ্ছে, দেয়ালের চাপড়া বেশিরভাগই খসে পড়েছে, ছাদে বিস্তর ফুটো—টুটো। মেঝের অবস্থাও ভালো নয়, অজস্র ফাটল। ভূতনাথবাবুর গিন্নি নাক সিটকে বলেই ফেললেন, এ তো মানুষের বাসযোগ্য নয়। ভূতনাথবাবুর দুই ছেলে আর তিন মেয়েরও মুখ বেশ ভার ভার। ভূতনাথবাবু সবই বুঝলেন। দুঃখ করে বললেন, আমার সামান্য মাস্টারির চাকরি থেকে যা আয় হয় তাতে তো এটাই আমার তাজমহল। তাও গঙ্গারামবাবুর ছেলেকে প্রাইভেট পড়াই বলে তিনি দাম একটু কম করেই নিলেন। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকায় এ বাজারে কি বাড়ি কেনা যায়! তবে তোমরা যতটা খারাপ ভাবছ ততটা হয়তো নয়। এ বাড়িতে বহুদিন ধরে কেউ বাস করত না বলে অযত্নে এরকম দুরবস্থা, টুকটাক মেরামত করে নিলে খারাপ হবে না। শত হলেও নিজেদের বাড়ি।

কথাটা ঠিক। এই মহীগঞ্জের মতো ছোটো গঞ্জেও বাড়ি ভাড়া বেশ চড়া। ভূতনাথবাবু যে বাড়িতে ছিলেন সে বাড়ির বাড়িওলা নিত্যই তাঁকে তুলে দেওয়ার জন্য নানা ফন্দিফিকির করত। মরিয়া হয়েই বাড়ি কেনার জন্য উঠে—পড়ে লেগেছিলেন তিনি।

যাই হোক, বাক্স—প্যাঁটরা নিয়ে, গিন্নি ও পাঁচ ছেলে—মেয়ে নিয়ে একদিন ভোরবেলা ভূতনাথবাবু বাড়িটায় ঢুকে পড়লেন। অপছন্দ হলেও বাড়িটা নিজের বলে সকলেরই খুশি—খুশি ভাব। সবাই মিলে বাড়িটা ঝাড়পোঁছ করতে আর ঘর সাজাতে লেগে গেল। ভূতনাথবাবুর ছাত্ররা এসে বাড়ির সামনের বাগানটাও সাফসুতরো করে দিল। কয়েকদিন আগে ভূতনাথবাবু নিজের হাতে গোলা চুন দিয়ে গোটা বাড়িটা চুনকাম করেছেন। তাতেও যে খুব একটা দেখনসই হয়েছে তা নয়, তবে বাড়িতে মানুষ থাকলে ধীরে ধীরে বাড়ির একটা লক্ষ্মীশ্রীও এসে যায়।

আজ আর রান্নাবান্না হয়নি, সবাই দুধ—চিঁড়ের ফলার খেয়ে ক্লান্ত হয়ে একটু গড়িয়ে নিতে শুয়েছে, এমন সময় একটা লোক এল। বেঁটেখাটো, কালো, রোগাটে চেহারা, পরনে হেঁটো ধুতি আর গেঞ্জি। গলায় তুলসীর মালা। ভূতনাথবাবু বারান্দায় মাদুর পেতে শুতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় লোকটা এসে হাতজোড় করে বলল, পেন্নাম হই বাবু, বাড়িটা কিনলেন বুঝি?

হ্যাঁ, তা আপনি কে?

আজ্ঞে আমি হলুম পরাণচন্দ্র দাস। চকবেড়ে থেকে আসছি। চকবেড়ের কাছেই গোবিন্দপুরে নিবাস।

অ। তা কাকে খুঁজছেন?

আমাকে আপনি—আজ্ঞে করবেন না। নিতান্তই তুচ্ছ লোক। আপনি বিদ্বান মানুষ। পুরোনো বাড়ি খোঁজা আমার খুব নেশা।

তাই নাকি?

আজ্ঞে, তা বাবু, কিছু পেলেন—টেলেন? সোনাদানা বা হিরে—জহরত কিছু?

ভূতনাথবাবু হেসে ফেললেন, তাই বলো! এইজন্য পুরোনো বাড়ি খুঁজে বেড়াও? না হে বাপু, আমার কপাল অত সরেস নয়, ধুলোবালি ছাড়া আর কিছু বেরোয়নি।

ভালো করে খুঁজলে বেরোতেও পারে। মেঝেগুলো একটু ঠুকে ঠুকে দেখবেন কোথাও ফাঁপা বলে মনে হয় কিনা।

বাড়িতে গুপ্তধন থাকলে গঙ্গারামবাবু কি আর টের পেতেন না? তিনি ঝানু বিষয়ী লোক।

পরাণ তবু হাল না ছেড়ে বলল, তবু একটু খুঁজে দেখবেন। কিছু বলা যায় না। এ তো মনে হচ্ছে একশো বছরের পুরোনো বাড়ি।

তা হতে পারে।

আর একটা কথা বাবু, তেনারা আছেন কিনা বলতে পারেন?

কে? কাদের কথা বলছ?

ওই ইয়ে আর কী— ওই যে রাম নাম করলে যারা পালায়।

ভূতনাথবাবু ফের হেসে ফেললেন, না হে বাপু, ভূতপ্রেতের সাক্ষাৎ এখনও পাইনি। আমার নাম ভূতনাথ হলেও ভূতপ্রেত আমি মানি না।

না বাবু, অমন কথা কবেন না, পুরোনো বাড়িতেই তেনাদের আস্তানা কিনা। আপনি আসাতে তাঁরা কুপিত হলেই মুশকিল।

তা আর কী করা যাবে বলো! থাকলে তাঁরাও থাকবেন, আমিও থাকব।

একটু বসব বাবু? অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছি।

ভূতনাথবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, বোসো বোসো। দাওয়া পরিষ্কারই আছে।

লোকটা সসংকোচে বারান্দার ধারে বসে বলল, তা বাবু, বাড়িটা কতয় কিনলেন?

তা বাপু, অনেক টাকাই লেগে গেল। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। ধারকর্জও হয়ে গেল মেলা।

উরিব্বাস! সে তো অনেক টাকা।

গরিবের কাছে অনেকই বটে, ধার শোধ করতে জিভ বেরিয়ে যাবে। তা তুমি বরং বোসো, আমি একটু গড়িয়ে নিই। বড্ড ধকল গেছে।

আচ্ছা বাবু, আমি একটু বসে থাকি।

ভূতনাথবাবু একটু চোখ বুজতেই ঘুম চলে এল। যখন চটকা ভাঙল তখন সন্ধ্যে হয়—হয়। অবাক হয়ে দেখলেন, পরাণ দাসও বারান্দার কোণে শুয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছে।

ভূতনাথবাবুর একটু মায়া হল। লোকটাকে ডেকে তুলে বললেন, তা পরাণ, তুমি এখন কোথায় যাবে?

পরাণ একটা হাই তুলে বলল, তাই ভাবছি।

ভাবছো মানে! তোমার বাড়ি নেই?

আছে, তবে সেখানে তো কেউ নেই। তাই বাড়ি যেতে ইচ্ছে যায় না। যা বললুম তা একটু খেয়াল রাখবেন বাবু। পুরোনো বাড়ি অনেক সময় ভারি পয়মন্ত হয়।

লোকটা উঠতে যাচ্ছিল। ভূতনাথবাবু বাধা দিয়ে বললেন, আহা, এই সন্ধ্যেবেলা রওনা হলে বাড়ি যেতে তো তোমার রাত পুইয়ে যাবে বাপু। আজ নতুন বাড়িতে ঢুকলুম, তুমিও অতিথি। থেকেও যেতে পারো। তিন—চারখানা ঘর আছে। বস্তা—টস্তা পেতে শুতে পারবে না?

পরাণ দাস আর দ্বিরুক্তি করল না, রয়ে গেল। সরল সোজা গাঁয়ের লোক দেখে ভূতনাথবাবুর গিন্নি বেশি আপত্তি করলেন না। শুধু বললেন, চোর—টোর নয়তো!

ভূতনাথবাবু ম্লান হেসে বললেন, হলেই বা আমাদের চিন্তার কী? আমাদের তো দীনদরিদ্র অবস্থা, চোরের নেওয়ার মতো জিনিস বা টাকাপয়সা কোথা?

পরাণ দাস কাজের লোক। কুয়ো থেকে জল তুলল, বাচ্চচাদের সঙ্গে খেলল, রাতে মশলা পিষে দিল। তারপর একখানা খেঁটে লাঠি নিয়ে সারা বাড়ির মেঝেতে ঠুক ঠুক করে ঠুকে ফাঁপা আছে কিনা দেখতে লাগল। কাণ্ড দেখে ভূতনাথবাবুর মায়াই হল। পাগল আর কাকে বলে!

খেয়ে—দেয়ে সবাই ঘুমোলো। শুধু পরাণ দাস বলল, আমি একটু চারদিক ঘুরে—টুরে দেখি। রাতের বেলাতেই সব অশৈলী কাণ্ড ঘটে কিনা।

মাঝরাতে নাড়া খেয়ে ভূতনাথবাবু উঠে বসলেন, কে?

সামনে হারিকেন হাতে পরাণ দাস। চাপা গলায় বলল, পেয়েছি বাবু।

অবাক হয়ে ভূতনাথবাবু বললেন, কী পেয়েছ?

যা খুঁজতে আসা। তবে বুড়োকর্তা দেখিয়ে না দিলে ও জায়গা খুঁজে বের করার সাধ্যি আমার ছিল না।

ভূতনাথবাবুর মাথা ঘুমে ভোম্বল হয়ে আছে। তাই আরও অবাক হয়ে বললেন, বুড়োকর্তাটা আবার কে?

একশো বছর আগে এ বাড়িটা তো তাঁরই ছিল কিনা। বড্ড ভালো মানুষ। সাদা ধবধবে দাড়ি, সাদা চুল, হেঁটো ধুতি পরা, আদুর গা, রং যেন দুধে—আলতায়। খুঁজে খুঁজে যখন হয়রান হচ্ছি তখনই যেন দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এলেন।

একটা হাই তুলে ভূতনাথবাবু বললেন, তুমি নিজে তো পাগল বটেই, এবার আমাকেও পাগল বানিয়ে ছাড়বে দেখছি। যাও গিয়ে শুয়ে একটু ঘুমোও বাপু।

বিশ্বাস হল না তো বাবু। আসুন তাহলে, নিজের চোখেই দেখবেন।

বিরক্ত হলেও ভূতনাথবাবুর একটু কৌতূহলও হল।

পরাণ দাসের পিছু পিছু বাড়ির পিছন দিকে রান্নাঘরের পাশের এঁদো ঘরখানায় ঢুকে থমকে গেলেন। মেঝের ওপর স্তূপাকার ইট, মাটি ছড়িয়ে আছে, তার মাঝখানে একটা গর্ত।

এসব কী করেছ হে পরাণ? মেঝেটা যে ভেঙে ফেলেছ।

যে আজ্ঞে, এবার গর্তে একটু উঁকি মেরে দেখুন।

হারিকেনের ম্লান আলোয় ভূতনাথবাবু গর্তের মধ্যে উঁকি মেরে দেখলেন একটা কালোমতো কলসি জাতীয় কিছু।

আসুন বাবু, নেমে পড়ুন। বড্ড ভারী, দু—জনা না হলে টেনে তোলা যাবে না।

ভূতনাথবাবুর হাত—পা কাঁপতে লাগল উত্তেজনায়। বললেন, কী আছে ওতে?

তুললেই দেখতে পাবেন। আসুন বাবু, একটু হাত লাগান।

ভূতনাথবাবু নামলেন। তারপর মুখ ঢাকা ভারী কলসিটা দু—জনে মিলে অতি কষ্টে তুললেন ওপরে। পরাণ একগাল হেসে বলল, এবার খুলে দেখুন বাবু আপনার জিনিস।

বেশ বড়ো পিতলের কলসি। মুখটায় একটা ঢাকনা খুব আঁট করে বসানো। শাবলের চাড় দিয়ে ঢাকনা খুলতেই চকচকে সোনার টাকা এই হারিকেনের আলোতেও ঝকমক করে উঠল।

বলেছিলুম কিনা বাবু! এখন দেখলেন তো। যান, আপনার আর কোনো দুঃখ থাকল না। দু—তিন পুরুষ হেসেখেলে চলে যাবে।

ভূতনাথবাবু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এরকমও হয়! পরাণের দিকে চেয়ে বললেন, এসব সত্যি তো! স্বপ্ন নয় তো!

না বাবু, স্বপ্ন নয়। বুড়োকর্তার সব কিছু এর মধ্যে। এত দিনে গতি হল।

ভূতনাথবাবু পরাণকে জড়িয়ে ধরে বললেন, পাগল হলেও তুমি খুব ভালো লোক। এর অর্ধেক তোমার।

পরাণ সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে বলল, ওরে বাবা, ও কথা শুনলেও পাপ। টাকাপয়সায় আমার কী হবে বাবু?

তার মানে? এত মোহর পেয়েও নেবে না?

না বাবু, আমার আছেটা কে যে ভোগ করবে? একা বোকা মানুষ, ঘুরে ঘুরে বেড়াই, বেশ আছি। টাকাপয়সা হলেই বাঁধা পড়ে যেতে হবে।

ভূতনাথবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, তাহলে গুপ্তধন খুঁজে বেড়াও কেন?

আজ্ঞে, ওইটে আমার নেশা। খুঁজে বেড়ানোতেই আনন্দ। লুকোচুরি খেলতে যেমন আনন্দ হয় এও তেমনি। আচ্ছা আসি বাবু। ভোর হয়ে আসছে, অনেকটা পথ যেতে হবে।

পরাণ দাস চলে যাওয়ার পর ভূতনাথবাবু অনেকক্ষণ বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ভাবলেন, একটা সামান্য লোকের কাছে হেরে যাব? ভেবে কলসিটা আবার গর্তে নামিয়ে মাটি চাপা দিলেন। ওপরে ইটগুলো খানিক সাজিয়ে রাখলেন। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে একটু হাসলেন।

শারদীয়া ১৪০৬

জকপুরের হাটে

নটবর সাউ সন্ধ্যে লাগতেই দোকান বন্ধ করে হাট করতে বেরিয়ে পড়ল। শেষ হাটে জিনিসপত্র বেজায় সস্তায় পাওয়া যায়। দোকানিরা ঝপাঝপ মাল বেচে হালকা হয়ে বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন।

জকপুরের হাট বেশি দূরেও নয়। আকন্দপুরের খালটা যেখানে মাওবেড়ের দিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে শিবতলার মাঠে বিরাট জায়গা জুড়ে হাট। হ্যাজাক, টেমি, কারবাইডের আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে যেন। কেউ কেউ দোকান গুটিয়ে ফেলেছে, কেউ কেউ গোটাচ্ছে আবার কোথাও রমরম করে বিকিকিনি চলছে।

ব্যাপারিরা বেশিরভাগই নটবরের মুখ চেনা। এই যেমন রায়দিঘির বিখ্যাত বেগুন নিয়ে আসে মুকুন্দ পাল, সোনার গাঁয়ের ফুলকপি নিয়ে বসে শিবু গায়েন, চণ্ডীগড়ের বড়ো বড়ো লাল মুলো বেচতে আসে হারান দাস। নটবরের অবশ্য আজ অন্য দরকারেও আসা। হাটের পশ্চিম ধারে এক বুড়োমতো মানুষকে মাঝে মাঝে টেমি জ্বালিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। তার লম্বা সাদা দাড়ি, বিশাল গোঁফ, মাথায় ঝাঁকড়া সাদা চুল। বয়স হেসেখেলে অন্তত পঁচাশি হবে। মুখখানার চামড়ায় অনেক ভাঁজ, মাথায় একটা সাদা টুপিও থাকে। মাঝে মাঝে গায়ে লাল রঙের কাপড় জুড়ে তৈরি একটা জোব্বা মতো। এই সাংঘাতিক শীতে খোলা মাঠের দিকে বসে বুড়ো কিছু পুথি—পুস্তক বিক্রি করতে বসে থাকে। গাঁয়ের লোক বই—টই বেশি পড়ে না। তাই বুড়োর বিক্রিবাট্টাও নেই। তবুও বুড়ো বসে থাকে।

সেবার হাটে এসে কৌতূহলের বশে নটবর তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বই দেখছিল, বিচিত্র সব নাম — 'মহাকাশের হাতছানি', 'পৃথিবীতে আজব মানুষের আগমন', 'সহজ উড়ন শিক্ষা', 'জাদুবলে রোগ আরোগ্য', 'দ্রব্যগুণের সাহায্যে গগনে বিহার'।

সবই বুজরুকি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কৌতূহল এক সাংঘাতিক ব্যাপার, ঝোঁক চাপলে মাথাটা যেন ভূতগ্রস্ত হয়ে যায়। নটবর কেনাকাটা সেরে বুড়োর দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। টেমির আলোয় ম্লান পুরোনো বইগুলো হলদেটে দেখাচ্ছে। বুড়ো শীতে জবুথবু হয়ে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বই—টই আগের দিনই দেখে পছন্দ করে রেখেছিল নটবর— 'সহজ ভূত নামাইবার কৌশল'।

'ও দাদু!'

বুড়ো চোখ চেয়ে নটবরকে দেখে বেজার মুখে বলে, 'কী চাই?'

'এই বইখানা কত দাম?'

'এক টাকা।'

'বইতে যা লেখা তাতে কাজ হয়?'

'কে জানে বাবু, আমি তো পরখ করিনি?'

'কাজ না হলে বই ফেরত দেব কিন্তু?'

'না বাবু, ওসব ফেরত—টেরত হবে না। নিলে নাও, না নিলে পথ দেখো।'

'আহা, এসব তো বুজরুকিও হতে পারে?'

'তা হতে পারে!'

নটবর একখানা টাকা ঠকাং করে ফেলে বইখানা তুলে নিল। গেল একখানা টাকা। তা আর কী করা যাবে!

বইখানা পকেটে পুরে নটবর বাড়ি রওনা হল।

না, ভূতে নটবরের বিশ্বাস নেই। সে ভূত—টুত মানে না। এই নিয়ে বন্ধু ভজহরির সঙ্গে তার প্রায়ই তর্ক হয়। ভজহরি আবার ঘোরতর ভূতে বিশ্বাসী। প্রায়ই বলে, 'এখন মানছ না, কিন্তু একদিন ঠেলায় পড়ে মানবে।'

ভূত না মানলেও কৌতূহলকে তো আর ঠেকানো যায় না।

আজ বড়োই শীত পড়েছে। তার গ্রাম শামুকখোলা একটু দূরেই। ভারী থালি দু—খানা দু—হাতে ঝুলিয়ে যথাসাধ্য জোরেই হাঁটছে নটবর। কুয়াশায় পথঘাট আবছা, তবে একটু ক্ষয়াটে জ্যোৎস্না থাকায় তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। রথতলা ছাড়িয়ে আমবাগানের পাশের রাস্তায় সবে পা দিয়েছে— এমন সময় একটা লোক পিছন থেকে তার পাশাপাশি এসে পড়ল।

লোকটা বলে উঠল, 'শামুকখোলা যাচ্ছেন নাকি মশাই?'

'হ্যাঁ।'

'ভালো ভালো। তা হাটে আজ কেমন কেনাকাটা হল?'

'এই টুকিটাকি।'

'মুলো, বেগুন সব পেলেন?'

'তা পেলাম।'

'বেশ বেশ।'

'তা আপনি কোন দিকে?'

'এই একটু বিষয় কার্যে এসে পড়েছিলাম এই দিকে। তা আর কী কিনলেন?'

'এ ঘরগেরস্থের টুকিটাকি জিনিস।'

লোকটা হেসে বলল, 'আছে কিন্তু।'

'কী আছে?'

'ওই যা বলছিলাম আর কী। আচ্ছা মশাই আসি, এই ডানহাতি আমার রাস্তা।'

নটবর ভালোমন্দ কিছুই বুঝতে পারল না। উটকো লোকটা যে কোথা থেকে উদয় হল, কোথায় অস্ত গেল কে জানে!

সামনেই বাঁ—ধারে কপালী দিঘি। চারধারে গাছগাছালি। দিঘির কোল ঘেঁষে রাস্তাটা পেরোনোর সময় হঠাৎ নটবরের মনে হল সামনের ঘাটে কে যেন চান করছে। এই শীতের রাতে ঠান্ডা জলে চান করে কে?

ঘাটের কাছে পৌঁছে দেখল চান করে একটা মোটাসোটা লোক উঠে এল। গামছা নিংড়োতে নিংড়োতে বলল, 'হাটে গিয়েছিলেন বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তা আপনি এই শীতের রাতে চান করছিলেন যে?'

'চান না করলে শরীরটা বড়ো ম্যাজম্যাজ করে। সারা দিনে আমি বার পঁচিশেক চান করি কিনা!'

'বলেন কী? ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়া হবে যে?'

লোকটা একটু হেসে বলে, 'আরে না, নিউমোনিয়া কী আর সকলের হয়! তা হাটে কী কী পেলেন?'

'এই একটু শীতের শাকপাতা।'

'শুধু শাকপাতা?'

'আর এই টুকিটাকি।'

'শুধু টুকিটাকি?'

'এই সামান্য জিনিসপত্তর।'

লোকটা গা মুছতে মুছতে বলল, 'তা বলে ভাববেন না যে নেই।'

'কী ভাবব না?'

'এখনও আছে, অনেক আছে। যাই আর একবার খুব ডুব দিয়ে আসি।'

লোকটা ফের জলে নেমে গেল দেখে নটবর হাঁ! আচ্ছা পাগল তো!

গাঁয়ের কাছ বরাবর চলে এসেছে নটবর। জটেশ্বরের খালের সাঁকোটা পেরোলেই গাঁয়ের সীমানায় ঢুকে পড়বে।

সাঁকোতে পা দিতেই নটবর দেখতে পেল সাঁকোর মাঝ বরাবর বাঁশের রেলিং—এ হাতে ভর রেখে একটা লোক ঝুঁকে জলের দিকে চেয়ে আছে। নটবর সাঁকোতে উঠতেই 'মচাৎ' করে শব্দ হওয়ায় লোকটা ফিরে তাকাল। চেনা মানুষ নয়।

'নটবর নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'হাট করে ফিরলেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছেন?'

'মাছ ধরছি।'

'মাছ ধরছেন।' বলে নটবর হাঁ হয়ে গেল। সাঁকোর ওপর থেকে এই রাত্তিরে মাছ ধরা যায় বলে সে জন্মে শোনেনি। হেসে বলল, 'কীভাবে ধরছেন? মন্তর দিয়ে নাকি?'

'না ছিপ দিয়ে। দেখবেন?'

লোকটার হাতে যে ছিপ রয়েছে সেটা এতক্ষণ লক্ষ করেনি নটবর। এবার করল। লোকটা ডান হাতের ছিপটা হঠাৎ 'ছপাৎ' করে ওপরে তুলতেই দেখা গেল বঁড়শিতে বেশ বড়োসড়ো একটা মাছ লাফঝাঁপ করছে। তাজ্জব ব্যাপার।

'দেখলেন তো নটবরবাবু?'

'দেখলাম। খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার।'

'না না, এ আর বিস্ময়ের কী? তা হাটে যা খুঁজতে গিয়েছিলেন তা পেলেন?'

'তা পেলাম, শীতের শাকসবজি আর কী।'

'উঁহু, ওসব নয়। আর যা খুঁজতে গিয়েছিলেন!'

'এই টুকিটাকি সব জিনিসপত্র। ঘরগেরস্থালিতে তো কত কিছুই লাগে!'

'সে আমি জানি। কিন্তু সে সব ছাড়া আর কিছু?'

'না, আর বিশেষ কী?'

'কী যে বলেন নটবরবাবু! যাকগে, কথাটা হল— ওসব নিয়ে বেশি মাথা না ঘামানোই ভালো।'

'কীসব নিয়ে! কীসের কথা বলছেন?'

'বলছিলাম কী, দু—তরফ নিজের নিজের মতো করে আছে। কাজ কী বলুন অন্য তরফের তল্লাশ নিতে যাওয়ার। ওতে অন্য তরফের অসুবিধে হয় কিনা।'

দুই তরফ! নটবর হঠাৎ একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে। কোন তরফের কথা বলতে চাইছে লোকটা!

'আচ্ছা আসি নটবরবাবু!' বলে লোকটা হনহন করে তার পাশ কাটিয়ে উলটো দিকে চলে গেল। তাকে ভেদ করেই গেল যেন! কিন্তু নটবরের গায়ে একটু ছায়াও লাগল না। হঠাৎ নটবরের গা শিউরে উঠল।

'বাপরে!' বলে বাজারের থলি ফেলে নটবর প্রাণপণে ছুটতে লাগল। পড়ি—কি—মরি অবস্থা।

পরদিন সে ভজহরিকে গিয়ে বইখানা দান করে বলল, 'আছে রে ভাই আছে।'

ভজহরি একগাল হেসে বলল, 'বলেছিলাম কি না!'

পুনার সেই হোটেল

বোম্বে থেকে সকালে ট্রেনে চাপলে একখানা সুন্দর পাহাড়ি পথ বেয়ে চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও পশ্চিমঘাটের ন্যাড়া পর্বতমালা দেখতে দেখতে (পুনা মারাঠি উচ্চচারণে পুনে) পেছে যাওয়া যায় দুপুরের মধ্যেই। মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলতে পুনা। বোম্বাই যেমন ব্যাবসাবাণিজ্যের শহর, পুনা তেমনি সাহিত্য—শিল্প—সংস্কৃতির পীঠস্থান।

দুপুরবেলা। নিজের লটবহর নিজেই বহন করা আমার অভ্যাস। তাই ট্রেন থেকে নেমে ক্ষুধাতৃষ্ণা এবং বোঝার ভারে কাতর অবস্থায় প্রথমেই যেটা চাই সেটা হল কাছাকাছি একটা হোটেল।

বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে হোটেলের জন্য অনেকবার বিপাকে পড়তে হয়েছে। এমন শহর অনেক আছে যেখানে স্টেশনের কাছে কোনো ভদ্রগোছের হোটেলই নেই, হয়তো বা স্টেশন থেকে শহরের দূরত্ব পাঁচ—ছ মাইল। অচেনা বিদেশ—বিভুঁয়ে গিয়ে যেমন—তেমন হোটেলে উঠতে ভরসা হয় না। একবার কটকে এবং একবার মাদ্রাজে এরকম হোটেলে উঠে বিপাকে পড়তে হয়েছিল।

তবে হোটেলের দিক থেকে পুনা আদর্শ জায়গা। স্টেশন চত্বরের বাইরেই উলটোদিকে হোটেলের সারি। পথশ্রমে ক্লান্ত আমি এত কাছে হোটেল পেয়ে ভারি খুশি।

প্রথমে যে হোটেলটা সবচেয়ে ঝকমকে দেখলাম সেটাতেই হানা দিলাম। বিশাল পাঁচতলা হোটেল। একটা ঘর পাওয়া যাবেই।

কিন্তু ম্যানেজার বিরস মুখে মাথা নেড়ে বলল, একটা ঘরও খালি নেই।

অনেক ধরা করা করলাম তাকে, অবশেষে সে বলল, তোমাকে বড়োজোর একরাত্রি থাকতে দিতে পারি, কাল সকালেই ছেড়ে দিতে হবে ঘর।

আমি এ প্রস্তাবে রাজি হলাম না। কারণ যে কাজে এসেছি তাতে ক—দিন থাকতে হবে তা না হলে তো মুশকিল। সুতরাং বেরিয়ে এসে পাশের আর একটা হোটেলে হানা দিলাম। সেখানেও ঘর নাই। সব ভরতি।

তৃতীয় হোটেলেও জায়গা না পেয়ে ভারি দমে গেলাম। এদিকে তেষ্টা বাড়ছে, খিদে বাড়ছে, বিরক্তি বাড়ছে, গরমে ঘামে চিটচিট করছে শরীর। ক্লান্তও বটে। বিপন্ন দেখে দালালরা পিছনে লেগেছে। কিন্তু দালালদের দ্বারা আমি কখনো চালিত হই না, তারা বেশিরভাগই এমন সব হোটেলে নিয়ে তোলে যার সুনাম নেই।

সুতরাং নিজেই খুঁজতে খুঁজতে এগোতে লাগলাম।

একটু দূরে এসেই বাগান—ঘেরা চমৎকার একটা দোতলা পুরোনো বাড়ি নজরে পড়ল। দোতলার ওপরে ছাদ নয়, লাল টিনের ছাউনি। ব্রিটিশ আমলের বাংলো প্যাটার্ন বাড়ি। হোটেলটার নাম— না, আসল নাম বলব না, মানহানির মামলা হয়ে যেতে পারে। ধরা যাক হোটেলটার নাম এ বি সি।

ম্যানেজারের চেহারাটা দারুণ ভালো। সাহেবদের মতো ফরসা, মোটা গোঁফ, পুরুষালি আকৃতি। ঘর চাইতেই বলল, ঘর আছে, তবে ফাইভ সিটেড রুম। তোমাকে ও ঘরে একাই থাকতে হবে, কারণ আর কোনো বোর্ডার নেই, পঞ্চাশ টাকা করে চাই।

আমি তৎক্ষণাৎ রাজি। জিনিসপত্রের বোঝা নামিয়ে স্নানটি করে কিছু মুখে দেওয়াই তখন সবচেয়ে জরুরি কাজ।

চাবি দিয়ে দোতলার একটি ঘর খুলে আমার জিনিসপত্র পৌঁছে দিয়ে বেয়ারা চলে গেল।

ঘরটা বেশ পছন্দ হল আমার। খুব উঁচুতে সিলিং। পুরোনো আমলের পাঁচটা সিঙ্গল খাটে বিছানা পাতা, আলমারি টেবিল চেয়ার সবই পুরোনো আমলের। ড্রেসিং টেবিল আলনা সবই আছে।

বেয়ারা চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে জুতো মোজা ছাড়ছি। হঠাৎ আলমারির একটা পাল্লা কোঁ—ওঁ—ওঁ শব্দ করে ধীরে ধীরে খুলে গেল। উঠে গিয়ে পাল্লাটা আবার চেপে গিয়ে জামাকাপড় বদলে নিলাম, স্নান করেই বেরোতে হবে কিছু খেয়ে নিতে, তারপর সারাদিনে অনেক কাজ।

ফ্যানটা চালিয়ে যখন গায়ের ঘাম শুকিয়ে নিচ্ছি তখন ফের আলমারির পাল্লাটা কোঁ—ওঁ—ওঁ করে খুলে গেল, আপনা থেকেই। কিছু মনে করার নেই। পুরোনো কাঠের আলমারি, কবজা হয়তো ঢিলে হয়ে গেছে। আবার পাল্লাটা ভেজিয়ে স্নান করতে চলে গেলাম।

বাথরুমটায় সেই ব্রিটিশ আমলের কমোড, বাথটাব, বেসিন, সবই পুরোনো দাগি ফাটা বা ভাঙা দেখলেই বোঝা যায় এই হোটেলটা একসময়ে বেশ অভিজাত ছিল, এখন নাভিশ্বাস ছাড়ছে।

স্নান সেরে এসে যখন আয়নার সামনে চুল আঁচড়াচ্ছি তখন আলমারির পাল্লা তৃতীয়বার কোঁ—ওঁ—ওঁ আর্তনাদ করে খুলল। একটু বিরক্তি বোধ করলাম। আলমারির মধ্যে অনেক পুরোনো খবরের কাগজ পড়ে আছে। তা থেকেই খানিকটা ছিঁড়ে ভাঁজ করে পাল্লার নীচে গোঁজা দিয়ে খুব টাইট করে পাল্লাটা বন্ধ করে দিলাম। তারপর দরজায় তালা দিয়ে বেরোলাম দুপুরের খাওয়া সেরে আসতে।

কাছাকাছি একটা হোটেলে খেয়ে ফিরে আসতে ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগেনি। ইচ্ছে ছিল, একটু বিশ্রাম নিয়ে কাজে বেরোব, ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে একটা বিছানায় গা ঢেলে দিয়ে সদ্য চোখ বুজেছি। পথশ্রমের ক্লান্তি এবং ভরা পেটের শান্তিতে চোখ জুড়ে এল সঙ্গে সঙ্গে।

কোঁ—ওঁ—ওঁ

একটু চমকে চোখ চাইলাম। অবাক কাণ্ড। খুব শক্ত করে গোঁজা দেওয়া পাল্লাটা আবার খুলে গেছে। অনেকক্ষণ আলমারিটার দিকে চেয়ে রইলাম। ঘরে যখন আমি প্রথম ঢুকেছিলাম তখন পাল্লাটা বন্ধ ছিল। আমি ঘরে ঢুকবার পর থেকেই বার বার খুলে যাচ্ছিল। এখন শক্ত করে গোঁজা দেওয়া সত্ত্বেও সেই কাণ্ড। ব্যাপারটা কী?

ধীরে ধীরে উঠলাম। আলমারির পাল্লায় আরও পুরু করে গোঁজা দিয়ে ভীষণ এঁটে বন্ধ করে দিলাম।

খটখট করে একটা শব্দ হল বাথরুমের দরজায়, যেন কেউ ভিতরে আটকে পড়েছে। ঠোকা দিয়ে জানাচ্ছে, খুলে দাও।

নিশ্চয়ই মনেরই ভুল। গিয়ে ফের শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু বাথরুমের দরজায় থেকে থেকে শব্দটা হতে থাকল। ধীরে ধীরে ঠোকার শব্দ জোরালো হয়ে উঠতে লাগল—খটখট—খটাখট—দুম—দুম।

উঠতে হল। গিয়ে বাথরুমের দরজাটা হাট করে খুলে দিলাম। ভিতরে কেউ নেই, থাকার কথাও নয়।

বাথরুম থেকে মুখ ফেরাতেই পিছনে ফের আলমারির পাল্লাটা খুব ধীরে ধীরে খুলে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। অলৌকিক ঘটনায় আমার বিশ্বাস আছে বটে, কিন্তু এরকম দিনদুপুরে বড়ো রাস্তার কাছাকাছি এরকম ঘটতে পারে বলে ধারণা ছিল না।

আমি অনুচ্চচ স্বরে বললাম, এ ঘরে যে—ই থেকে থাক, আমাকে বিরক্ত করো না, আমিও তোমাকে বিরক্ত করব না।

সে কথা কেউ কানে তুলল বলে মনে হল না।

বিছানায় এসে যখন ফের শুয়েছি তখন যুগপৎ আলমারি এবং বাথরুমের দরজা বার বার বন্ধ হয়ে ফের খুলে যেতে লাগল দুমদাম শব্দে।

উঠে পড়লাম। বিশ্রাম হবে না। কাজও অনেক।

যখন বেরিয়ে আসছি তখন দেখলাম, পাশের ঘরটা ফাঁকা, কোনো লোক নেই, অবাক লাগল, কারণ কাছাকাছি কোনো হোটেলে ঘর খালি নেই, কিন্তু এই হোটেলে ফাঁকা ঘর অবহেলায় পড়ে আছে। একতলায় নামবার আগে ভালো করে ঘুরে দেখলাম, দোতলার মোট চারখানি ঘরের তিনখানাই ফাঁকা। একখানা ঘরে শুধু আমি।

এরপর আর অবশ্য ভূতুড়ে ব্যাপার নিয়ে ভাববার সময় ছিল না। অনেকগুলো জায়গায় যেতে হল। বিভিন্ন লোকের সঙ্গে দেখা করতে হল। আর এইসব করতে করতে সন্ধ্যে গড়িয়ে অন্ধকার নেমে এল চারদিকে।

যখন হোটেলে ফিরলাম তখন রাত আটটা, বাইরের একটা রেস্তোরাঁয় রাতের খাওয়া সেরে এসেছি। সুতরাং নিশ্চিন্ত।

ঘরের তালা খুলতে গিয়েই মনে পড়ে গেল, দুপুরের সব কাণ্ডমাণ্ড। একটু ধড়াস করে উঠল বুক। এই ঘরে আমাকে একটা রাত কাটাতে হবে। শুধু তাই নয়, দোতলায় আমি একদম একা।

কিন্তু ভয় পেলে আমার চলে না। কাজে বেরিয়ে নানা জায়গায় আমাকে একাই থাকতে হয়েছে। জঙ্গলে, পাহাড়ে, নদীর ধারে, ভয় ফেলে চলবে না। বিদেশ—বিভুঁয়ে ভয় হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো শত্রু।

ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললাম এবং অনেকক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু আলমারির পাল্লা বা বাথরুমের দরজা কোনো বেয়াদবি করল না।

জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে ঘরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। সারাদিন ধকল গেছে অনেক। ঘুম এল বলে, আমার ঘুমও খুব গাঢ়। সহজে ভাঙে না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে শুয়ে আস্তে আস্তে টানছিলাম। বড়ো ক্লান্তি, সিগারেট শেষ করেই ঢলে পড়ব ঘুমে।

কখন সিগারেট শেষ হয়েছে, কখন ঘুমিয়ে পড়েছি তা বলতে পারব না। কিন্তু হঠাৎ ঘুম ভাঙল, আলো নেবাতে ভুলে গেছি। ঘরটা ঝকঝক করছে আলোয়।

কিন্তু ঘুম ভাঙল কেন? এত ক্লান্ত হয়ে শুয়েছি যে, ভোরের আগে ঘুম ভাঙবার কথাই নয়।

একটা হাই তুলে উঠে বসলাম। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। উঁচু টিনের চালে চড়চড় শব্দ। একটু ঝোড়ো বাতাসও বইছে, সোঁ সোঁ আওয়াজ।

জলের গেলাসটার জন্য হাত বাড়িয়েই থেমে যেতে হল।

ও কী? আমার সামনে ছ—খানা টান টান করে পাতা বিছানা। তার মধ্যে ডান হাতের একদম কোণের দিকের বিছানাটার বালিশ খুব ধীরে ধীরে ডিগবাজি খাচ্ছে। সেই সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে চাদর।

চোখের সামনে দেখতে দেখতে দ্বিতীয় বিছানাটার চাদরও ডিগবাজি খাওয়া বালিশে জড়িয়ে যেতে লাগল। তারপর তৃতীয় বিছানাতেও সেই একই কাণ্ড।

নড়তে পারছি না। চেঁচিয়ে কোনো লাভ নেই। বিকেলেই দেখে গিয়েছি চাকর বা বেয়ারাকে ডাকার জন্য যে কলিং বেল রয়েছে তা অকেজো। সুতরাং আমি বিচ্ছিন্ন, একা এবং অসহায়।

কিন্তু আমি একটা জিনিস মানি। ভয়ের চেয়ে বড়ো শত্রু নেই। খুব ছেলেবেলায়— বোধহয় ছয় কী সাত বছর বয়স থেকে দীর্ঘকাল নিশুত রাতে আমি একটা ভূতুড়ে পায়ের শব্দ শুনতাম। প্রথমে ভয় পেতাম, কিন্তু পরে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। রোজ নয়, মাঝে মাঝে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে আমি সেই অমোঘ শব্দ শুনেছি। সেই কারণেই ভয় পেলেও, সেটা অস্বাভাবিক রকমের ভয় নয়। আমার হাত—পা কাঁপছে না, শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে না, শুধু বুকটা ধড়াস ধড়াস শব্দ করছে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে আছি।

বালিশগুলো ডিগবাজি খেয়ে খেয়ে আবার স্বস্থানে ফিরল।

সব শান্ত।

আমি একটু জল খেয়ে সিগারেট ধরালাম।

প্রায় দশ মিনিট ঘরে কোনো শব্দ নেই। ঘটনা ঘটছে না।

একটা শ্বাস ফেলে উঠলাম। বারান্দায় যাব বলে দরজাটা খুলবার জন্য ছিটকিনির দিকে হাত বাড়িয়েছি। ছিটকিনিটা আপনা থেকেই খটাস করে পড়ে গেল। হুড়ুম করে খুলে গেল দরজাটা। আর অদ্ভুত ব্যাপার যে, ঘরের ভিতর থেকে একটা বাতাসের ঝাপটা আমাকে ধাক্কা মেরে বারান্দায় বের করে দিল।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। ধীরে ধীরে উঠলাম। দরজাটার দিকে ফিরে বললাম, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করিনি। তাহলে এরকম করলে কেন?

দরজার পাল্লা দুটো ঠাস করে বন্ধ হয়ে গেল।

ঠেলে দেখলাম। ছিটকিনি বন্ধ।

আমি চেঁচামেচি করলাম না। লোক ডাকতে ছুটলাম না। কেন যেন মনে হচ্ছিল, ওসব করে লাভ নেই, যা কিছু করার আমাকেই করতে হবে।

কিন্তু কী করব? কী আমার করার আছে?

রেলিং—এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নিশুতি রাত্রির বৃষ্টি আর বাতাসের ঝাপটা খেলাম। তারপর চোখ বুজে হাত জোড় করে ঠাকুরের কাছে প্রাণভরে প্রার্থনা করলাম, ওর সুমতি দাও। ওর রাগ ওর যন্ত্রণা ঘুচিয়ে দাও। ও শান্ত হোক। ও বুঝুক আমি ওর শত্রু নই।

প্রার্থনার সময় চোখে একটু জল এসেছিল আমার। ধ্যানে ঠাকুরের মুখশ্রী জ্বলজ্বল করে ভেসে উঠেছিল আজ্ঞাচক্রে।

খুট করে একটা শব্দ।

চেয়ে দেখি দরজাটা খুলে গেল ধীরে ধীরে।

আমি এগিয়ে গেলাম। ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিই। আলমারি বন্ধ বাথরুমের দরজা যথারীতি ভেজানো। বিছানাগুলো টানটান পাতা।

বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘরে আর শব্দ নেই। ঘটনা নেই। অবশেষে তার সঙ্গে আমার ভাব—সাব হয়েছে বুঝতে পেরে নিশ্চিন্তে চোখ বুঝলাম আমি।

এক ঘুমে ভোর।

দুই পালোয়ান

পালোয়ান কিশোরী সিং—এর যে ভূতের ভয় আছে তা কাকপক্ষীতেও জানে না। কিশোরী সিং নিজেও যে খুব ভালো জানত এমন নয়।

আসলে কিশোরী ছেলেবেলা থেকে বিখ্যাত লোক। সর্বদাই চেলাচামুণ্ডারা তাকে ঘিরে থাকে। একা থাকার কোনো সুযোগই নেই তার। আর একথা কে না জানে যে একা না হলে ভূতেরা ঠিক সুবিধে করে উঠতে পারে না। জো পায় না।

সকালে উঠে কিশোরী তার সাকরেদ আর সঙ্গীদের নিয়ে হাজারখানেক বুকডন আর বৈঠক দেয়। তারপর দঙ্গলে নেমে পড়ে। কোস্তাকুস্তি করে বিস্তর ঘাম ঝরিয়ে দুপুরে একটু বিশ্রাম। বিকেলে প্রায়ই কারও—না—কারও সঙ্গে লড়াইতে নামতে হয়। সন্ধ্যের পর একটু গানবাজনা শুনতে ভালোবাসে কিশোরী। রাতে সে পাথরের মতো পড়ে এক ঘুমে রাত কাবার করে। তখন তার গা—হাত—পা দাবিয়ে দেয় তার সাকরেদরা। এই নিশ্ছিদ্র রুটিনের মধ্যে ভূতেরা ঢুকবার কোনো ফাঁকই পায় না।

গণপত মাহাতো নামে আর একজন কুস্তিগির আছে। সেও মস্ত পালোয়ান। দেশ— বিদেশের বিস্তর দৈত্যদানবের মতো পালোয়ানকে সে কাত করেছে। কিন্তু পারেনি শুধু কিশোরী সিংকে। অথচ শুধু কিশোরী সিংকে হারাতে পারলেই সে সেরা পালোয়ানের খেতাবটা জিতে নিতে পারে।

কিন্তু মুশকিল হল নিতান্ত বাগে পেয়েও নিতান্ত কপালের ফেরে সে কিশোরীকে হারাতে পারেনি। সেবার লক্ষ্ণৌতে কিশোরীকে সে যখন চিত করে প্রায় পেড়ে ফেলেছে সেই সময়ে কোথা থেকে হতচ্ছাড়া এক মশা এসে তার নাকের মধ্যে ঢুকে এমন পন পন করতে লাগল হাঁচি না দিয়ে আর উপায় রইল না তার। আর সেই ফাঁকে কিশোরী তার প্যাঁচ কেটে বেরিয়ে গেল। আর দ্বিতীয় হাঁচিটার সুযোগে তাকে রদ্দা মেরে চিত করে ফেলে দিল।

পাটনাতেও ঘটল আর এক কাণ্ড। সেবার কিশোরীকে বগলে চেপে খুব কায়দা করে স্ক্রু প্যাঁচ আঁটছিল গণপত। কিশোরীর তখন দমসম অবস্থা। ঠিক সেই সময়ে একটা ষাঁড় খেপে গিয়ে দঙ্গলের মধ্যে ঢুকে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাধিয়ে দিল। কিন্তু গণপত দেখল এই সুযোগ হাতছাড়া হলে আর কিশোরীকে হারানো যাবে না। সুতরাং সে প্যাঁচটা টাইট রেখে কিশোরীকে ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়ার ফিকির খুঁজছিল। সেই সময় ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে দর্শকরা সব পালিয়েছে আর ষাঁড়টা আর কাউকে না পেয়ে দুই পালোয়ানের দিকেই তেড়ে এল।

কিশোরী তখন বলল, গণপত, ছেড়ে দাও। ষাঁড় বড়ো ভয়ংকর জিনিস।

গণপত বলল, ষাঁড় তো ষাঁড়, স্বয়ং শিব এলেও ছাড়ছি না।

ষাঁড়টা গুঁতোতে এলে গণপত অন্য বগলে সেটাকে চেপে ধরল। সে যে কী সাংঘাতিক লড়াই হয়েছিল তা যে না দেখেছে সে বুঝবে না। দেখেছেও অনেকে। গাছের ডালে ঝুলে, পুকুরের জলে নেমে, বাড়ির ছাদে উঠে যারা আত্মরক্ষা করছিল তারা অনেকেই দেখেছে। গণপত লড়াই করছে দুই মহাবিক্রম পালোয়ানের সঙ্গে— ষাঁড় এবং কিশোরী সিং। গাছের ডালে ঝুলে, পুকুরে ডুবে থেকেও সে লড়াই দেখে লোকে চেঁচিয়ে বাহবা দিচ্ছিল গণপতকে।

ষাঁড়ের গুঁতো, কিশোরীর হুড়ো এই দুইকে সামাল দিতে গণপত কিছু গণ্ডগোল করে ফেলেছিল ঠিকই। আসলে কোন বগলে কে সেইটেই গুলিয়ে গিয়েছিল তার। হুড়যুদ্ধুর মধ্যে যখন সে এক বগলের আপদকে জুতসই একটা প্যাঁচ মেরে মাটিতে ফেলেছে তখনও তার ধারণা যে চিত হয়েছে কিশোরীই।

কিন্তু নসিব খারাপ। কিশোরী নয়, চিত হয়েছিল ষাঁড়টাই। আর সেই ফাঁকে কিশোরী তার ঘাড়ে উঠে লেংগউটি প্যাঁচ মেরে ফেলে দিয়ে জিতে গেল।

তৃতীয়বার তালতলার বিখ্যাত আখড়ায় কিশোরীর সঙ্গে ফের মোলাকাত হল। গণপত রাগে দুঃখে তখন দুনো হয়ে উঠেছে। সেই গণপতের সঙ্গে সুন্দরবনের বাঘ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়ে লেজ গুটিয়ে পালাবে। তার হুংকারে তখন মেদিনী কম্পমান।

লড়াই যখন শুরু হল তখনই লোকে বুঝে গেল, আজকের লড়াইতে কিশোরীর কোনো আশাই নেই। কিশোরী তখন গণপতের নাগাল এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াতে ব্যস্ত।

ঠিক এই সময়ে ঘটনাটা ঘটল। ভাদ্র মাস। তালতলার বিখ্যাত পাঁচসেরী সাতসেরী তাল ফলে আছে চারধারে। সেই সব চ্যাম্পিয়ন তালদের একজন সেইসময়ে বোঁটা ছিঁড়ে নেমে এল নীচে। আর পড়বি তো পড় সোজা গণপতের মাথার মধ্যিখানে।

গণপতের ভালো করে আর ঘটনাটা মনে নেই। তবে লোকে বলে, তালটা পড়ার পরই নাকি গণপত কেমন স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে গালে হাত দিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। সে যে লড়াই করছে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী যে কিশোরী, এবং সতর্ক না হলে যে বিপদ তা আর তার মাথায় নেই তখন। সে নাকি গালে হাত দিয়ে হঠাৎ বিড়বিড় করে তুলসীদাসের রামচরিতমানস মুখস্থ বলে যাচ্ছিল। কিশোরী যখন সেই সুযোগে তাকে চিত করে তখনও সে নাকি কিছুমাত্র বাধা দেয়নি। হাতজোড় করে রামজীকে প্রণাম জানাচ্ছিল।

গণপতের বয়স হয়েছে। শরীরের আর সেই তাগদ নেই। কিশোরী সিংকে হারিয়ে যে খেতাবটা সে জিততে পারল না এসব কথাই সে সারাক্ষণ ভাবে।

ভাবতে ভাবতে কী হল কে জানে। একদিন আর গণপতকে দেখা গেল না।

ওদিকে কিশোরীর এখন ভারি নামডাক। বড়ো বড়ো ওস্তাদকে হারিয়ে সে মেলা কাপ মেডেল পায়। লোকে বলে, কিশোরীর মতো পালোয়ান দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই।

তা একদিন ডাকে কিশোরীর নামে একটা পোস্টকার্ড এল। গণপতের আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে লেখা, ভাই কিশোরী, তোমাকে হারাতে পারিনি জীবনে এই আমার সবচেয়ে বড়ো দুঃখ। একবার মশা, একবার ষাঁড়, আর একবার তাল আমার সাধে বাদ সেধেছে। তবু তোমার সঙ্গে আর একবার লড়বার বড়ো সাধ। তবে লোকজনের সামনে নয়। আমরা দুই পালোয়ান নির্জনে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করব। আমি হারালে তোমাকে গুরু বলে মেনে নেব। তুমি হারালে আমাকে গুরু বলে মেনে নেবে। কে হারল, কে জিতল তা বাইরের কেউ জানবে না। জানব শুধু আমি, আর জানবে তুমি। যদি রাজি থাকো তবে আগামী অমাবস্যায় খেতুপুরের শ্মশানের ধারে ফাঁকা মাঠটায় বিকেলবেলায় চলে এসো। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

চিঠিটা পড়ে কিশোরী একটু ভাবিত হল। সত্যি বটে, গণপত খুব বড়ো পালোয়ান। এবং কপালের জোরেই তিন তিনবার কিশোরীর কাছে জিততে জিততেও হেরে গেছে। অতবড়ো একটা পালোয়ানের এই সামান্য আবদারটুকু রাখতে কোনো দোষ নেই। হারলেও কিশোরীর ক্ষতি নেই। সাক্ষীসাবুদ তো থাকবে না। কিন্তু হারার প্রশ্নও ওঠে না। কিশোরী এখন অনেক পরিণত, অনেক অভিজ্ঞ। তা ছাড়া গণপতকে যে সে খুব ভালোভাবে হারাতে পারেনি সেই লজ্জাটাও তার আছে। সুতরাং লজ্জাটা দূর করার এই—ই সুযোগ। এবার গণপতকে ন্যায্যমতো হারিয়ে সে মনের খচখচানি থেকে মুক্ত হবে।

নির্দিষ্ট দিনে কিশোরী তৈরি হয়ে খেতুপুরের দিকে রওনা হল। জায়গাটা বেশি দূরেও নয়। তিন পোয়া পথ। নিরিবিলি জায়গা।

শ্মশানের ধারে মাঠটায় গণপত অপেক্ষা করছিল। কিশোরীকে দেখে খুশি হয়ে বলল, এসেছো! তাহলে লড়াইটা হয়েই যাক।

কিশোরীও গোঁফ মুচড়ে বলল, হোক।

দু—জনে ল্যাঙট এঁটে, গায়ে মাটি থাবড়ে নিয়ে তৈরি হল।

তারপর দুই পালোয়ান তেড়ে এল দু—দিক থেকে। কিশোরী ঠিক করেছিল, পয়লা চোটেই গণপতকে মাটি থেকে শূন্যে তুলে ধোবিপাট মেরে কেল্লা ফতে করে দেবে।

কিন্তু সাপটে ধরার মুহূর্তেই হঠাৎ পোঁ করে একটা মশা এসে নাকে ঢুকে বিপত্তি বাধালে। হ্যাঁচ্চো হ্যাচচোঁ হাঁচিতে গগন কেঁপে উঠল। আর কিশোরী দেখল, কে যেন তাকে শূন্যে তুলে মাটিতে ফেলে চিত করে দিল।

গণপত বলল, আর একবার।

কিশোরী লাফিয়ে উঠে বলল, আলবাত।

দ্বিতীয় দফায় যা হওয়ার তাই হল। লড়াই লাগতে—না—লাগতেই একটা ষাঁড় কোথা থেকে এসে যে কিশোরীর বগলে ঢুকল তা কে বলবে। কিশোরী আবার চিত।

গণপত বলল, আর একবার হবে?

কিশোরী বলল, নিশ্চয়ই।

কী হবে তা বলাই বাহুল্য। লড়াই লাগতে—না—লাগতেই দশাসই এক তাল এসে পড়ল কিশোরীর মাথায়। কিশোরী 'পাখি সব করে রব' আওড়াতে লাগল। এবং ফের চিত হল।

হতভম্বের মতো যখন কিশোরী উঠে দাঁড়াল তখন দেখল, গণপতকে ঘিরে ধরে কারা যেন খুব উল্লাস করছে। কিন্তু তারা কেউই মানুষ নয়! কেমন যেন কালো কালো, ঝুলকালির মতো রং, রোগা, তেঠেঙে লম্বা সব অদ্ভুত জীব।

জীব? না কি অন্য কিছু?

কিশোরী হাঁ করে দেখল, গণপতও আস্তে আস্তে শুকিয়ে, কালচে মেরে, লম্বা হয়ে ওদের মতোই হয়ে যেতে লাগল।

কিশোরী আর দাঁড়ায়নি, 'বাবা রে, মা রে' বলে চেঁচিয়ে দৌড়াতে লেগেছে।

* * *

কিশোরী পালোয়ানের ভূতের ভয় আছে, একথা এখনও লোকে জানে না বটে। কিন্তু কিশোরী নিজে খুব জানে। আর এই জানলে তোমরা।

ছায়ার লড়াই

বিশ্বম্ভর রোগাভোগা নিরীহ মানুষ। ভারি ভীতুও বটে। তা সেই বিশ্বম্ভরের কাছে একদিন পোস্টকার্ডে খবর এল যে, তার এক দূরসম্পর্কের জ্যাঠা সম্প্রতি মারা গেছেন। নদিয়ার সাতপুরা গাঁয়ে তাঁর বসতবাড়ি আর জমিজমার হক বর্তেছে বিশ্বম্ভর বিশ্বাসের ওপর। সে যেন অতি সত্বর গিয়ে সম্পত্তির দখল নেয়, নইলে অন্য বন্দোবস্ত হবে।

বিশ্বম্ভরের অবস্থা এমনিতেই খারাপ, দিন আনি দিন খাই অবস্থা, রোজগারপাতি নেই। সামান্য জমিজমা যাও ছিল তা মহাজনের কাছে বাঁধা। ভাগ্য ভালো সে সংসারে সে একদম একা, সম্বল একখানা কুঁড়েঘর আর যৎসামান্য তৈজসপত্র।

সুতরাং চিঠিটা একরকম ভগবানের আশীর্বাদ বলেই তার মনে হল। তবে সাতপুরার জ্যাঠার কথা তার জানা ছিল না। পোস্টকার্ড পেয়েই প্রথম জানল। প্রথমটা ভেবেছিল কেউ তার সঙ্গে রসিকতা করেই হয়তো চিঠিটা লিখেছে। তারপর বিবেচনা করে দেখল, তার মতো অধম মনিষ্যির সঙ্গে রসিকতা করার মতো লোকই বা কে আছে। আর পোস্টকার্ডে সাতপুরা ডাকঘরের ছাপও রয়েছে যখন, গিয়ে দেখে এলে হয়।

বিশ্বম্ভরের জিনিসপত্র বিশেষ নেই, যা ছিল তা পাশের বাড়ির জিম্মায় রেখে, দরজায় একটা তালা ঝুলিয়ে, পুঁটলি বগলে বেরিয়ে পড়ল। যা থাকে কপালে। সঙ্গে চেনা দেওয়ার প্রমাণপত্র হিসেবে ভোটের কার্ডখানা সম্বল।

সকালে বেরিয়ে সাতপুরায় পৌঁছোতে বিকেল গড়িয়ে গেল প্রায়। গাঁয়ের মোড়লমশাই তার পরিচয় পেয়ে খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, তাহলে তুমিই নিবারণদাদার ভাইপো! আমি বাপু সাচ্চচা লোক, বেঁচে থাকতে এ গাঁয়ে কোনো অধর্ম হতে দেব না। তা যাও বাপু, নিজের জ্যাঠার সম্পত্তি বুঝে নাও গে। সঙ্গে লোক দিচ্ছি, সে বাড়ি চিনিয়ে দেবে।

বিশ্বম্ভর বাড়ি দেখে হাঁ, রাজপ্রসাদ নয় বটে, কিন্তু তার মতো হাঘরে লোকের কাছে এতবড়ো পাকাবাড়ি প্রাসাদের কমও কিছু নয়। সঙ্গের লোকটা চাবি দিয়ে দরজা খুলে দিল, বলল, ব্যবস্থা সব ভালোই হে, আতান্তরে পড়বে না। যাও, ঢুকে পড়ো।

তা ঢুকেই পড়ল বিশ্বম্ভর। একতলা বাড়ি হলে কী হয়, গোটা চারেক বড়ো বড়ো ঘর, ভিতরে দরদালান, উঠোন, বাইরের দিকে চওড়া বারান্দা। বাগানও আছে বেশ বড়োসড়ো। না হোক এক—দেড় বিঘে জমি।

ঘরে জিনিসপত্রের কোনো অভাব নেই। চৌকি আছে, খাট আছে, চেয়ার—টেবিল আছে, আলনা আছে, মেলা বাক্স—প্যাঁটরা আছে। রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, গ্যাসের ব্যবস্থা আছে। চাল—ডালও পাওয়া গেল। উঠোনের পাতকুয়ো থেকে ঠান্ডা জল তুলে হাত—মুখ ধুয়ে চাট্টি চিঁড়ে ভিজিয়ে এ আকস্মিক সৌভাগ্যের কথা ভাবছিল। জ্যাঠার নাম নিবারণ বিশ্বাস। অনেক ভেবে তার মনে পড়ল, ছেলেবেলায় একজন পালোয়ানের মতো লোক মাঝে মাঝে তাদের গাঁয়ে আসত বটে।

যতদূর মনে পড়ে তাঁর নাম নিবারণ ছিল বটে।

গাঁয়ের দু—চারজন মাতব্বর মতো লোক এসে তার সঙ্গে দেখা করে গেল। সে ঠিক লোক কিনা তাও একটু যাচিয়ে দেখল। বিশ্বম্ভর ভয়ে তটস্থ। যেন পানাপুকুর থেকে বড়ো গাঙে এসে পড়েছে।

একজন একটু ঠেস দিয়ে বলে গেল, নাঃ, ভাইপো মোটেই নিবারণদার মতো হয়নি। নিবারণদা কত ডাকাবুকো মানুষ ছিল।

তা হবে। রাতে ডাল—ভাত রান্না করে খেয়ে সে একখানা হারিকেন জ্বেলে শোওয়ার ঘরে এসে আরাম করে বসল। তার ভারি একটা আনন্দ হচ্ছে। রোজ সকালে উঠে পেটের চিন্তা করতে হবে না, ধার—বাকির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরতে হবে না, উঞ্ছবৃত্তি বোধহয় এবার ঘুচল।

হঠাৎ একটু আঁতকে উঠল বিশ্বম্ভর। হারিকেনের আলোয় সামনের দেওয়ালে একটা বেশ লম্বা—চওড়া লোকের ছায়া পড়ছে। লোকটা ডন দিচ্ছে হুপহাপ করে। বিশ্বম্ভর তো হাঁ। ই কী কাণ্ড রে বাবা! সিঁটিয়ে বসে সে দেখল লোকটা দুশো ডন দিয়ে উঠে নিজের হাত—পা—বুক দু—হাতে মালিশ করে নিয়ে ফের দুশো বৈঠকি দিল। বড়ো বড়ো শ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছে বিশ্বম্ভর। বৈঠক শেষ করে লোকটা হঠাৎ কুঁজো হয়ে দুই ঊরুতে থাবড়া মারতে মারতে বলে উঠল, চলে এসো।

সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের অন্য ধার থেকে একটা পেল্লায় চেহারার ছায়া এগিয়ে এল। তারপর দুই ছায়ায় কী কুস্তি। ধুন্ধুমার কাণ্ড যাকে বলে। এ ওকে তুলে আছাড় মারে, তো ও একে তুলে পটকে দেয়। দুইজনের হুমহাম শব্দে বাড়ি একেবারে সরগরম।

ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল ঠিকই, তবে বিশ্বম্ভরের কুস্তি দেখতে তেমন খারাপও লাগছিল না। কুস্তিতে যে কত রকমের প্যাঁচ—পয়জার আছে তা জানাও ছিল না তার। প্রথমটায় ভেবেছিল হারিকেনটা নিবিয়ে দেবে। কিন্তু সেটা আর করেনি।

রাত প্রায় বারোটা অবধি কুস্তি করার পর দুই পালোয়ান ক্ষ্যান্ত দিল আর বিশ্বম্ভরও হারিকেন কমিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন আবার একটু রাতের দিকে ওই কাণ্ড। দু—জন পালোয়ানের লড়াই। আজ আরও নতুন নতুন সব প্যাঁচ, নতুন ধরনের ল্যাং মারা, নতুন সব রদ্দা। বিশ্বম্ভর খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল। ভয়ডর উবে গেছে। বরং বেশ নেশাই হচ্ছে তার।

পরদিন বিশ্বম্ভর একেবারে কোণের ঘরে পালোয়ান জ্যাঠামশায়ের মুগুর, বারবেল, ডামবেল, ডন মারা খড়ম সব খুঁজে পেল। একটু লজ্জা—লজ্জা করছিল বটে, কিন্তু চট করে কয়েকটা ডন—বৈঠক দিয়ে নেওয়ার লোভও সামলাতে পারল না সে। তবে অনভ্যাসে হাড়গুলো সব মড়মড় করে উঠল। হাত—পা ভেরে এল। আর রাতে হল গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা।

তবে দেয়ালে দুই পালোয়ানের ছায়ার কুস্তি রোজই রাতে চলতে লাগল। রোজই খুব মন দিয়ে দেখে বিশ্বম্ভর এবং সকালে আর বিকেলে রীতিমতো কোণের ঘরে গিয়ে ব্যায়াম করে।

কয়েকদিনের মধ্যেই তার খাওয়া দ্বিগুণ, তিনগুণ বেড়ে গেল। আর রোগা রোগা হাত—পায়েও যেন ডুমো ডুমো মাংস ফুটে উঠতে লাগল, বুকখানাও যেন ঠেলে উঠল পালোয়ানদের মতো, গাঁয়ের লোক বলাবলি করতে লাগল, না হে, এ নিবারণদাদার উপযুক্ত ভাইপোই বটে।

এরপর যে ঘটনাটা ঘটল সেটা সাংঘাতিক। এক রাতে হঠাৎ প্রথম পালোয়ানের ছায়াটা তাকে ইশারা করে উঠে আসতে বলল। সে ভয়ে ভয়ে বিছানা ছেড়ে নামতেই ছায়াটা লাফিয়ে পড়ে তাকে সাপটে ধরে ল্যাং মেরে ফেলে দিল মেঝের ওপর। কিন্তু বিশ্বম্ভর আর আগের মতো রোগা দুর্বল নয়, সেও লাফিয়ে উঠে পালটা প্যাঁচ কষে ছায়াটাকে লড়াই দিতে লাগল। ছায়াটা বলল, শাবাশ বিশে।

এইরকম রোজই হতে লাগল। আর হতে হতে বিশ্বম্ভর দিব্যি মুগুরের মতো হাত—পা বানিয়ে ফেলল, পেল্লায় বুকের ছাতি। গাঁসুদ্ধ লোক তাকে বাহবা দিয়ে বলল, তবে আর কী! নিবারণদাদা যাকে কোনোদিন হারাতে পারেননি সেই নবকুমার এবার লড়তে আসছে গাঁয়ে। যদি তাকে হারাতে পারে তাহলে খালু মহাজন দশ হাজার টাকা প্রাইজ দেবে।

শুনে তো বিশ্বম্ভর ভয়ে অস্থির। কিন্তু নিবারণ জ্যাঠার ছায়া অভয় দিয়ে বলল, নবকুমারের অস্ত্র হচ্ছে ওর পেল্লায় পেট। ওই পেট দিয়ে চেপে ধরেই ও সবাইকে হারায়। তুই ওর পেটটা এড়িয়ে চলিস, তাহলেই হবে।

লড়াইয়ের দিন গাঁ ভেঙে পড়ল আখড়ায়। বিকট গর্জন করতে করতে নবকুমার নেমে পড়ল আসরে। বিশ্বম্ভরকেও ঠেলে নামিয়ে দিলে গাঁয়ের মাতব্বররা।

প্রথমদিকে বিশ্বম্ভর বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারছিল না বটে। নবকুমারের গায়ে সাংঘাতিক জোর। প্যাঁচ—পয়জারও জানে ভালো। কিন্তু বিশ্বম্ভর একটু চালাকি করে হঠাৎ দূরে সরে গিয়ে তারপর খ্যাপা ষাঁড়ের মতো তেড়ে গিয়ে নবকুমারকে বিস্মিত করে তার পেটে একটা ঢুঁ মারল। কামানের গোলার মতো সেই ঢুঁ খেয়ে নবকুমার সেই যে চিতপাত হল, তারপর উঠল তিন মিনিট বাদে। ততক্ষণে লড়াই শেষ।

বিশ্বম্ভরের জয়ধ্বনিতে সাতপুরায় তখন কান পাতা দায়।

একান্ন টাকা

খাঁদু মল্লিকের কাছে মদন বৈরাগীর একান্ন টাকা ধার ছিল। দেখতে—না—দেখতে ছ—মাস কেটে গেছে। টাকাটা এখনও মদনের জোগাড় হয়নি। খাঁদুর সুদ খুব চড়া। দু—মাস আগে নফরগঞ্জে শুনে এসেছিল, একান্ন টাকা নাকি চার মাসে সুদে—আসলে তিরাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। কত হারে সুদ সেটা মদনের ধারণাও নেই। অঙ্কের নামগন্ধ সে জানে না, সুদকষা দূরে থাক। যাই হোক খাঁদু মল্লিকের টাকাটা কিছুতেই শুধে উঠতে পারছে না সে। দশ টাকা রোজগার হলে ন—টাকা খরচ। একান্ন টাকা দু—মাস আগে তিরাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সায় দাঁড়িয়েছিল বটে, কিন্তু গত দু—মাসে খাঁদু তাকে কোথায় ঠেলে তুলেছে কে জানে।

নফরগঞ্জ থেকে পির নসিবপুর মোটে দু—মাইল রাস্তা। মদন নফরগঞ্জে গেলে যেমন খাঁদুর খবর পায়, তেমনি খাঁদুর কাছেও খবর পৌঁছে যায়। মদন ভয়ে আর পির নসিবপুরের রাস্তা মাড়ায় না বটে, কিন্তু সে জানে, গা—ঢাকা দিয়ে বেশিদিন খাঁদুর হাত থেকে বাঁচা যাবে না।

নফরগঞ্জের আটাচাক্কির পিয়ারী নস্কর মদনকে চক্রবৃদ্ধি সুদ জিনিসটা কী তা দুপুরবেলায় বোঝাচ্ছিল। মদন ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝল না বটে, কিন্তু ব্যাপারটা যে ঘোরালো হয়ে উঠছে তার একটা আন্দাজ হল। ধূপ বেচে তার গোটা বিশেক টাকা নিট মুনাফা হয়েছে, কিন্তু পিয়ারী বলল, একটু একটু করে দিয়ে কোনো লাভ নেই। ওতে আরও সুদটা তেড়েফুঁড়ে ওঠে। পারো তো বাপু গোটাটাই একদিন ঝপ করে ফেলে দাও।

মদন ভাবিত হল। কারও কারও কাছে একান্ন টাকা মোটে টাকাই নয় বটে, কিন্তু ধূপ আর ধূপকাঠি বেচে মদনের যা আয় হয় সেই হিসেবে একান্ন টাকা পর্বতের সমান।

অঘোর মান্না মদনের কাছ থেকে পাঁচ প্যাকেট 'চন্দন শলাকা' নিল। অঘোর বেশ লোক, নগদানগদি মিটিয়ে দেয়, ঘোরায় না। বলল, তা তোর সুদে—আসলে শুনলুম একশো ছাড়িয়েছে। পরশু খাঁদু এসেছিল আলকাতরা কিনতে। তখনই কথা হল।

মদনের বয়স এই সাতাশ পুরল। তবু কথাটা শুনে নিজেকে ভারি জবুথবু বুড়ো মানুষ বলে মনে হচ্ছিল তার। একটা দীর্ঘশ্বাসও বেরিয়ে গেল তার। দুনিয়ার খেল বোঝা দুষ্কর। একান্ন যে কোন মন্তরে একশো ছাড়িয়ে গেল কে জানে।

একান্নটা টাকা যে মানুষের কতবড়ো শত্তুর হতে পারে তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে মদন। রাতে খারাপ স্বপ্ন দেখছে, মাঝে মাঝে বুকটা ধকধক করে উঠছে, জিব শুকোচ্ছে।

নফরগঞ্জে আজ হাটবার। গাঁ—গঞ্জ থেকে হাট প্রায় উঠেই যাচ্ছে। ময়রাদিঘির হাট বিখ্যাত ছিল। এখন পাকা বাজার হওয়ার পর থেকে হাট বসছে না। বসবেই বা কোথায়? ফাঁকা মাঠ ভরাট হয়ে বাড়িঘর উঠে পড়ছে। চারদিকেই বেশ উন্নতির লক্ষণ দেখছে মদন, শুধু তারই তেমন কিছু হয়ে উঠছে না। নোনাপুকুর গাঁয়ে তার একখানা পৈতৃক ভদ্রাসন আছে মাত্র। টিনের ঘর দু—খানা, একটা দাওয়া, একচিলতে উঠোন। মা—বাবা পটল তুলেছে কবেই, একাবোকা মদনই ভিটে কামড়ে পড়ে আছে। তিন কুলে আর কারও খবর জানা নেই তার। কেউ তার খবরও কস্মিনকালে নেয় না। লেখাপড়া একটু শিখেছিল, অঙ্কের জন্যই উঁচু ক্লাসে উঠতে পারল না। দু—এক ক্লাস উঁচুতে উঠেই দেখেছে, অঙ্ক যেন বনবেড়াল থেকে হালুম—বাঘা হয়ে উঠছে। লেখাপড়া করতে হলে পিছনে হুড়ো দেওয়ার কাউকে চাই। তা সেরকম কেউ তো ছিল না তার যে, তাড়ন—পীড়ন করে বা বাবা—বাছা বলে পড়তে বসাবে।

হাটে আজ ভিড় মন্দ হয়নি। মেলা ব্যাপারি, মেলা খদ্দের। মদন তার দু—খানা হাতব্যাগে নিয়ে হাটের ধারে বটতলায় বসে গেল। পাশেই সেফটিপিন—চিরুনি—বোতাম— ডটপেনওয়ালা সতু শীট। ওপাশে কুড়ি টাকায় এক সেট ঘড়ি—লাইটার—চিরুনি পেনসিল টর্চওয়ালা পটলডাঙার হরিশ পাল। ওদের তবু খদ্দের আছে। মদন প্লাস্টিকের সবুজ চাদরটা পেতে ধূপকাঠি আর ধূপের প্যাকেট সাজাতে লাগল।

হরিশ বিক্রিবাটার মাঝখানেই বলল, একজন বুড়ো মানুষ তোর খোঁজ করছিল রে মদনা? খিটকেলে বুড়ো।

মদন হাসল। কে খিটকেলে নয় বাবা! দু—টাকা চার টাকায় সস্তা মাল কিনবে, তায় আবার নানা বায়নাক্কা। কিন্তু ব্যবসা করতে গেলে ওসব সয়ে নিতে হয়।

তার চন্দন শলাকা আর রানি ধূপ মন্দ বিকোয় না। চন্দন শলাকাটা সে নিজেই বানায়। বাকিগুলো পাইকারের কাছে কেনে। নোনাপুকুরের ধীরেন গোঁসাইয়ের সুগন্ধি ওয়ার্কস—এর মালও আছে কয়েক রকমের। দোকান খুলতেই আজ চার প্যাকেট মশার ধূপ, পাঁচ প্যাকেট চন্দন শলাকা বিক্রি হয়ে গেল। বউনি খারাপ হয়নি, কিন্তু এই বিক্রিবাটায় পেটটা হয়তো চালিয়ে নেওয়া যায়, খাঁদু মল্লিকের চক্রবৃদ্ধির সুদ মেটানো কী ইহজন্মে সম্ভব?

খিটকেলে বুড়োটা এল। গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবি, হেঁটো ধুতি, পায়ে হাওয়াই।

এই যে বাপু, তুমি বলেছিলে, ধূপ পছন্দ না হলে পয়সা ফেরত।

মদন বলে, সে তো ঠিক কথা।

এই যে রাতের রানি ধূপকাঠি দিয়েছ, পাঁচ টাকায় কেনা, এর গন্ধে বাড়িতে টেঁকা যাচ্ছে না। দুটো কাঠি কিন্তু খরচা হয়েছে।

মদন অম্লান মুখে বলল, তাতে কী? দিন, ফেরত নিচ্ছি।

পুরো পয়সা ফেরত পেয়ে বুড়োটা যেন একটু হতভম্ব হয়ে গেল। পয়সা হাতে নিয়ে হাঁ করে একটু তাকিয়ে রইল মদনের দিকে। তারপর অবাক ভাবটা গিলে একটু দোনোমোনো করে হাটবাগে হাঁটা দিল।

সতু শীট বলল, এরকম পয়সা ফেরত দিস বলে ব্যবসা লাটে উঠছে তোর। পয়সা ফেরত না দিয়ে অন্য কোনো ব্র্যান্ড গছাতে পারিস তো!

আরে না। ওসব করলে লোকে খুশি হয় না।

খুশির যা নমুনা দেখছি!

যে যাই বলুক মদন তার নিয়ম মেনেই চলে। পছন্দ না হলে পয়সা ফেরত কবুল করেও খদ্দেরকে ঘোরানো সে পছন্দ করে না। বলতে নেই, ফেরত—এর কেস তার খুব কমই হয়।

বিষ্ণুপদ মণ্ডল পয়সাওলা লোক। নজরও উঁচু। বটতলার হকারদের কাছ থেকে জিনিস কেনার পাত্রই নয়। আজ কী ভেবে কে জানে, বটতলায় দাঁড়িয়ে গেল। তারপর মদনের কাছেই এগিয়ে এসে বলল, তোমার না চন্দন শলাকা বলে একটা ধূপকাঠি আছে?

মদন সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, আজ্ঞে আছে। আমার নিজের তৈরি।

বটে! ভালো ভালো। সেদিন আমার চাকর শশী নিয়ে গিয়েছিল এক প্যাকেট। আমার গিন্নির সেটা খুব পছন্দ হয়েছে। তা কয় প্যাকেট এনেছ?

তা অনেক আছে, বিশ—পঁচিশ প্যাকেট।

দিয়ে দাও।

বিস্মিত মদন বলে, সব ক—টা?

হ্যাঁ। সব ক—টা। কত করে প্যাকেট?

এমনিতে চার টাকা। তবে একসঙ্গে পাঁচ প্যাকেট নিলে সাড়ে তিন টাকা।

কনসেশন লাগবে না। চার টাকা করেই দেব। পরের বার আরও একটু বেশি করে এনো। আমার সুধা স্টোর্সে রাখব'খন। আর একটা কথা বাপু, জিনিসের দাম কম করলেই যে বিক্রি হবে তা কিন্তু নয়। আজকাল লোকের পকেটে পয়সা এসেছে। কম দামের জিনিস লোকে সন্দেহের চোখে দেখে। প্যাকেজিংটা ভালো কোরো, তাহলে লোকে নেড়েচেড়ে দেখবে। দেখতে ম্যাড়ম্যাড়ে হলে লোকে ছুঁতে চায় না।

একসঙ্গে সাতাশ প্যাকেট চন্দন শলাকা বেচে মদন একটু থতমতই খেয়ে গেল। টাকাও হল মন্দ নয়। এই ধূপকাঠিটা সে নিজে হাতে যত্ন করে তৈরি করে। লাভ তাতে বেশিই হয়। প্যাকেটে দু—টাকার মতো। হিসেব করলে শুধু চন্দন শলাকাতেই তার নিট লাভ চুয়ান্ন টাকা।

সতু বলল, হাঁ করে ভাবছিস কী?

ভাবছি, আজ একটু শিঙাড়া—জিলিপি খাব।

সতু হাসল, বড়ো খদ্দের বরাত দিয়ে গেল বুঝি?

বাপ রে! বিষ্ণুপদ মণ্ডল বলে কথা!

দ্যাখ, কতদিন নেয়। তবে তুই তো বোকা। চার টাকায় ছাড়লি। বিষ্ণুপদ কম করেও দশ টাকা প্যাকেট বিক্রি করবে। খোঁজ নিয়ে দেখিস।

তা মদনের আজ জিলিপি—শিঙাড়াও হল। এখন খাঁদু মল্লিকের শোধ হলেই হয়। ওটা গলার কাঁটা হয়ে আছে।

দিনান্তে মোট পঁচাত্তর টাকা নাফা হল মদনের। একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছে সে। বিষ্ণুপদ যদি চন্দন শলাকা নিয়মিত নেয় তাহলে সে মালমশলা কিনে একটু বেশি মাল তৈরি করতে শুরু করবে। খাঁদু মল্লিকের ধারটা শোধ হলেই সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে পারে। ওই ধারটা তার গলার কাঁটা হয়ে আছে।

জিনিসপত্তর ব্যাগে ভরে প্লাস্টিকের চাদরটা গুটিয়ে উঠতে যাচ্ছে মদন, ঠিক এমন সময় সেই খিটকেলে বুড়োটা এল। মুখে একটু হাসি।

মদন ভদ্রতা করে বলল, কিছু বলবেন?

বুড়ো মানুষটা একটু আমতা আমতা করে বলল, বলছিলাম কী, দোকানদারদের সঙ্গে আমি এই বুড়ো বয়সে আর পেরে উঠি না বাবা। বয়স হয়েছে তো, কেনাকাটা করতে গিয়ে ভুলভ্রান্তি হয়। বাড়িতে ফিরে বকুনি খাই। জিনিস ফেরত দিতে এলে দোকানদাররা বড্ড মুখঝামটা দেয়, দাঁত খিঁচোয়। একমাত্র তুমিই দেখলাম, হাসিমুখে ভাঙা প্যাকেট ফেরত নিয়ে পুরো পয়সা ফেরত দিলে।

ও কিছু নয় মশাই, খদ্দের হল লক্ষ্মী। পারতপক্ষে তাদের চটাতে নেই।

সে আর ক—জন বোঝে বলো! তা তুমি থাকো কোথায় বাপু?

আমার বাড়ি সেই নোনাপুকুর। বাসে গেলে ধোকরহাটিতে নেমে দু—মাইল হাঁটা পথ।

বাড়িতে কে আছে?

আজ্ঞে হাওয়া—বাতাস ছাড়া আর কেউ নেই।

বুড়ো লোকটা গম্ভীর হয়ে বলে, তা হাওয়া—বাতাসই বা খারাপ কী? সেও ফ্যালনা জিনিস নয়। বিনি—মাগনা পাওয়া যায় বলে কদর নেই।

মদন ঘাড় কাত করে বলে, তা বটে।

তা বাপু, আজ লাভটা কীরকম হল?

মদন একগাল হেসে বলে, তা মশাই, মোট পঁচাত্তর টাকা হয়েছে। একদিনে প্রায় সাতদিনের রোজগার। ভাসাভাসি কাণ্ড যাকে বলে।

তুমি লোকটা তো খারাপ নও। লাভ আরও হবে। ধারটাও শোধ হয়ে যাবে।

মদন অবাক হয়ে বলে, ধার! কোন ধারের কথা বলছেন?

লোকটা অপ্রস্তুত হয়ে বলে, বুড়ো মানুষের কথা ধোরো না বাবা। উলটোপালটা বলে ফেলি। ধারকর্জ নেই তো?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মদন বলে, আছে মশাই, একান্ন টাকা নাকি সুদে—আসলে একশো দাঁড়িয়েছে।

একশো সতেরো টাকা।

অ্যাঁ! আপনি জানলেন কী করে?

আমি! না আমি জানি না কিছু। এইরকমই কী যেন বাতাসে শুনতে পেলাম। মাস গেলে একশো বিয়াল্লিশে দাঁড়াবে।

মদনের একগাল মাছি। বলে কী লোকটা?

লোকটা ভারি আনমনে অন্যদিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলল, শোধ হয়ে গেলেও তারপরও অনেক থাকবে। শুধু নিজেকে ভুলে যেয়ো না।

চোখের পলকে লোকটা ভাঙা হাটের ভিড়ের মধ্যে মিশে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল।

মদন ভারি অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে বাস ধরে বাড়ি ফিরল।

কিন্তু তিন মাসের মধ্যে খাঁদু মল্লিকের ধার শোধ হয়ে হাজার পাঁচেক টাকা মূলধন দাঁড়াল মদনের। চন্দন শলাকা ছাড়াও সে কস্তুরী শলাকা, যূথিকা শলাকা, গোলাপ শলাকা, মল্লিকা শলাকা বের করেছে। মাল বাজারে পড়তে পায় না। দেদার বিক্রি। চারজন কর্মচারী রাখতে হল তাকে। ভাসাভাসি কাণ্ডই বটে। ফিরি করতে হয় না, বাড়ি থেকেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে আজকাল।

শুধু মাঝে মাঝে বুড়ো মানুষটার কথা মনে হয় তার। নিজেকে ভুলতে বারণ করেছিল। মদন বিড়বিড় করে বলে, না বাবা, ভুলব না। ভুলব না।

শারদীয়া ১৪১৪

টেঁকুর

প্রায় চৌদ্দ পুরুষের বসতবাড়িটা দারুব্রহ্মবাবুকে বিক্রি করে দিতে হচ্ছে। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই ভালো। একে তো এতবড়ো বাড়ি কেনার খদ্দের নেই, তার ওপর যদি বা খদ্দের জোটে তারা ভালো দাম দিতে চায় না। বলে, এই অজ পাড়াগাঁয়ে ও বাড়ি কিনে হবেটা কী? কথাটা সত্যি। তবে বহুকাল আগে এ গ্রাম ছিল পুরোদস্তুর একখানা শহর। এই বাড়িতে দারুব্রহ্মের যে ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ বাস করতেন তিনিই ছিলেন এই অঞ্চলের রাজা। তখনকার আস্তাবল, দ্বাদশ শিবের মন্দির, পদ্মদিঘি, দেওয়ান—ই—আম, দেওয়ান—ই—খাস, নহবতখানা, শিশমহল সবই এখনও ভগ্নদশায় আছে। ফটকের দু—ধারে মরচে পড়া দু—দুটো কামানও। এতদিনে খদ্দের পাওয়া গেছে।

দারুব্রহ্মের অবস্থা খুবই খারাপ। এবেলা ভাত জুটলে ওবেলা খুদও জুটতে চায় না। নিজে বিয়ে করেনি। বাপের একমাত্র সন্তান। বাপ গত হয়েছেন, সুতরাং বুড়ি মা আর তাঁর দু—মুঠো জুটে যাওয়ার কথা, কিন্তু বংশের নিয়ম মানতে হয় বলে একপাল অপোগণ্ড নিষ্কর্মা আত্মীয়স্বজনকে ঠাঁই দিতে হয়েছে। তারা দিনরাত চেঁচামেচি করে মাথা ধরিয়ে দেয়। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই দারুব্রহ্মের চুল পাকতে লেগেছে, আশা—ভরসা গেছে। বুড়ি—মা বিয়ের জন্য মেয়ে দেখে রেখেছেন। কিন্তু মেয়ের বাপ এই হাড়—হাভাতের হাতে মেয়ে দিতে রাজি নন। অপমানটা খুব লেগেছে দারুব্রহ্মের। বাড়ি কেনার খদ্দের জুটে যাওয়ায় খানিকটা নিশ্চিন্ত। হাজার পঞ্চাশেক টাকা পেলে মায়ে পোয়ে কাশীবাসী হবে, ঠিক করেই রেখেছে।

শেষবার চৌদ্দ পুরুষের বসতবাড়িটা ঘুরে—ঘুরে দেখছিল দারুব্রহ্ম। ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ সত্যব্রহ্ম ছিলেন দারুণ মেজাজি। একটা মশা সেবার তাঁর নাকে হুল ফোটানোয় রেগে গিয়ে তিনি মশা মারতে কামান দাগার হুকুম দেন। কিন্তু তোপদার এসে খবর দিল, কামানের মশলা নেই। সত্যব্রহ্ম তখন বলেন, কুছ পরোয়া নেই। বন্দুক আনো। শোনা যায়, কম—সে—কম শতখানেক গুলি চালানোর পর মশাটা বাস্তবিকই মরেছিল। এখনও দরবার ঘরের দেয়ালে সেইসব গুলির জখম রয়েছে। দারুব্রহ্ম সেগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে একটা দুটো তিনটে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফেলল।

ঊর্ধ্বতন নবম পুরুষ পূর্ণব্রহ্মের খুব শিকারের শখ ছিল। তাই বলে জঙ্গলে—টঙ্গলে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে বা মাচানে বসে শিকার করতেন না। খুব আমুদে অলস লোক। দোতলা থেকে নীচে নামতে হলেই গায়ে জ্বর আসত। তিনি দোতলায় একটা আলাদা ছাদ তৈরি করে মাটি ফেলে জঙ্গল বানিয়ে নিয়েছিলেন। সেখানে আগে থেকে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা শেকলে—বাঁধা বাঘ থাকত। তিনি জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বাঘের দেখা পেলেই গুলি করতেন। আর বাঘটাও লুটিয়ে পড়ত। অবশ্য সবাই জানত বন্দুকে ভরা গুলিটা আসলে ফাঁকা গুলি। আর বাঘটা ছিল পোষা। সেই এক বাঘই কত বাঘের মরণ মরেছে। দোতলায় উঠে দারুব্রহ্ম সেই জঙ্গলের ধ্বংসাবশেষের দিকে চেয়ে থাকে। দীর্ঘশ্বাসের ঝড় বইতে থাকে।

ঊর্ধ্বতন তৃতীয় পুরুষ কৃষ্ণব্রহ্ম ছিলেন পালোয়ান। দু—হাতে দু—মন ওজনের দুটো মুগুর ঘুরিয়ে রোজ দু—বেলা ব্যায়াম করতেন। সেই মুগুর দুটো দোতলার সিঁড়ির মুখেই রাখা। দারুব্রহ্ম মায়াভরে সে দুটোকে দু—হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে চোখ বুজে রইল কিছুক্ষণ।

তিনতলার সব ঘর বহুকাল হল তালাবন্ধ। ছাদ ফেটেছে, জানালার শিক আছে তো পাল্লা নেই। পাল্লা থাকলে শিক নেই। বাদুড় চামচিকের বাসা। যত রাজ্যের পুরোনো জিনিসের আবর্জনা ডাঁই করে রাখা। শেষবারের মতো সবকিছু দেখে নেওয়ার জন্য দারুব্রহ্ম তালা খুলে ঢুকে পড়ল। কাঠের সিন্দুক, দেয়াল আলমারি, ভাঙা ঝাড়লণ্ঠন, পুরোনো নাগরা, ভাঙা খাট, কত কী চারদিকে ছড়ানো।

কাঠের সিন্দুক খুলে এটা—সেটা নাড়াচাড়া করছিল দারুব্রহ্ম আর এটা—সেটা ভাবছিল। এমন সময় হাত ফসকে কী একটা যেন মেঝেয় পড়ে গেল। একটু চমকে উঠল দারুব্রহ্ম। চমকাবারই কথা। জিনিসটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ঝলকানি আর সেই সঙ্গে খানিক ধোঁয়া বেরোল। দারুব্রহ্ম জিনিসটা কুড়িয়ে নিতে গিয়ে দেখে, সেটা একটা প্রদীপ। প্রদীপটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবছে, চোখে পড়ল ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা সামনেই পাকিয়ে পাকিয়ে একটা লম্বা রোগা সুঁটকো লোকের চেহারা নিচ্ছে।

'কে রে?' দারুব্রহ্ম চেঁচিয়ে ওঠে।

লোকটা গোটা চারেক হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বলল, 'আমি? আমি হচ্ছি প্রদীপের দৈত্য।'

দারুব্রহ্ম হাঁ। ব্যাটা বলে কী? সে বলল, 'ইয়ার্কির জায়গা পাওনি? দিনে—দুপুরে ব্যাটা চুরির মতলবে বাড়িতে ঢুকে বসে আছ।'

লোকটা ভয় খেয়ে বলে, 'সত্যি না। অনেককাল কেউ ডাকাডাকি করেনি বলে বেশ হাজার দেড়েক বছর একটানা ঘুমিয়ে এই উঠলাম। চুরি—টুরি কিছু হয়ে থাকলে আমি কিন্তু জানি না।'

দারুব্রহ্ম সাহসী বংশের লোক। সহজে ভয় খায় না। তবে সে বুঝল, লোকটা গুল দিচ্ছে না। প্রদীপটাও আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ হতে পারে। তার বংশের অনেকেরই নানা বিদঘুটে জিনিস সংগ্রহের বাতিক ছিল। সে বলল, 'বটে? তা তোর কাজটা কী?'

আবার গোটা কয়েক হাই তুলে বিশুদ্ধ বাংলাতেই লোকটা বিরস মুখে বলল, 'আমার আবার কাজ কী? দেড় হাজার বছর পরে ঝুটমুট কাঁচা ঘুমটা ভাঙালেন, এখন যা করতে বলবেন তাই করতে হবে। কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি, প্রথমেই শক্ত কাজ দেবেন না, আমার এখনও ঘুমের রেশ কাটেনি। গা ম্যাজ ম্যাজ করছে।'

দারুব্রহ্ম বুঝল, এ ব্যাটা আলাদীনের সেই দৈত্যই বটে, তবে ফাঁকি মারার তাল করছে। সে বলল, 'বাপু হে, অত রোয়াব দেখালে কী চলে? বরাবর অনেক বড়ো—বড়ো কাজ করে এসেছ, সব খবর রাখি। এখন পিছোলে চলবে কেন?'

লোকটা ব্যাজার হয়ে বলে, 'সে করেছি, কিন্তু বহুকাল অভ্যাস নেই কিনা। তা ছাড়া ঘুমোলে হবে কী, খাওয়া তো আর জোটেনি। দেড় হাজার বছর টানা উপোস। শরীরটা দেখুন না কেমন শুকিয়ে গেছে। আগে বরং কিছু খাবার—দাবার দিন।'

'তারপর?'

'তারপর যা বলবেন একটু—আধটু করে দেব।'

দারুব্রহ্ম লোক খারাপ নয়। দৈত্যটার সুড়ুঙ্গে চেহারা দেখে তার কষ্টও হল। বলল, 'চলো, দেখি মুড়িটুড়ি কিছু পাওয়া যায় কিনা।' বলে লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে নীচে নামল দারুব্রহ্ম। বাড়ির কেউই লোকটাকে দেখে তেমন গা করল না। গা করার মতো কিছু নেই। দারুব্রহ্ম তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে ধামা ভরে মুড়ি আর বাতাসা খাওয়াল। সব শেষে দেড় ঘটি জল খেয়ে লোকটা বলল, 'এ যা খাওয়ালেন এতে তো একটা ঢেঁকুরও উঠবে না। যাকগে, ওবেলা কী রান্না হবে?'

দারুব্রহ্ম একটা শ্বাস ফেলে বলল, 'একদিন এ বাড়ির অতিথিরা মাংস—পোলাও খেয়ে একটা করে মোহর দক্ষিণা নিয়ে যেত। সেদিন তো আর নেই। ওবেলা যদি হাঁড়ি চড়ে তবে দুটো ডাল—ভাত জুটতে পারে।'

লোকটা মন খারাপ করে বলল, 'ডাল—ভাত। ছোঃ।'

দারুব্রহ্ম হেসে ফেলে বলল, 'তুমি দেখি উলটো কথা বলতে লেগেছ। প্রদীপের দৈত্যই কোথায় খাবার—দাবার জোগাড় করে আনবে, তা তুমিই উলটে চাইতে লাগলে।'

লোকটা জবাব দিল না। ধোঁয়া হয়ে প্রদীপের মধ্যে মিলিয়ে গেল। রাত্রে সকলের খাওয়া হয়ে গেলে দারুব্রহ্ম প্রদীপটা ঠুকে আবার দৈত্যটাকে জাগায়। দৈত্যটা চারজনের খোরাক একা খেয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমার খোরাকটা একটু বেশিই। তা ভরপেট না হলেও ক্ষতি নেই কিন্তু একটা ঢেঁকুর তো উঠবে। এতে তো একটা ঢেঁকুরও উঠল না।' একটা হাই তুলে 'যাই ঘুমোই গিয়ে' বলে দৈত্যটা আবার প্রদীপের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

পরদিন দেখা গেল, দৈত্যকে একবেলা খাওয়াতে গিয়েই চালের ডোল ফাঁকা হয়ে গেছে। দারুব্রহ্ম ভাবল, আহা বেচারা। কতকাল খায়নি। একদিন তো ব্যাটার কাছ থেকে সুদে—আসলে সবই উশুল করব, ক—

দিন বরং পেট ভরে খাক।

দারুব্রহ্ম পুরোনো সব দলিল—দস্তাবেজ বের করে খুঁজতে—খুঁজতে সন্ধান পেল, চৌমারির চরে তাদের কিছু জমি বহুকাল ধরে আছে, কিন্তু খাজনা বা ফসল আদায় হয়নি। একটা তেলকলের অংশীদারিরও সন্ধান পেল। খুঁজে পেতে দেখল, পুরো একটা তহসিলের খবরও সে এতকাল রাখত না। ছেঁড়া ছাতা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ল দারুব্রহ্ম। দাগ—নম্বর ধরে—ধরে খুঁজে—পেতে জমির সন্ধান পেল। প্রজারা তাকে দেখে প্রথমে একটু বেগড়বাঁই করলেও স্বীকার করল যে বহুকাল তারা খাজনা বা ফসল দেয়নি। বাবা—বাছা বলে তুতিয়ে—পাতিয়ে তাঁদের কাছ থেকে দারুব্রহ্ম কিছু আদায় করার চেষ্টা করছিল। এমন সময় মোড়ল চোখ মুছতে—মুছতে এসে বলল, 'জমির মালিককে বঞ্চিত করেছি বলেই আমাদের ঘরে লক্ষ্মী নেই। আপনি যান। আমরা নিজে থেকেই পৌঁছে দেব যা দেওয়ার।'

দারুব্রহ্ম তেলকলে গিয়ে দেখল সেটা বেশ রমরম করে চলছে। দারুব্রহ্ম কাগজপত্র বের করে দাবিদাওয়া জানাতেই তেলকলের মালিক মূর্ছা গেল। জেগে উঠে বলল, 'দলিলে দেখছি আপনি দশ আনার মালিক। তবে আমার থাকবে কী?' যাকগে, এসব তো জানা ছিল না। কবেকার কথা সব। এখন একটা বন্দোবস্ত করা যাবে। আপনি যান।'

তহসিলটাও দারুব্রহ্মকে হতাশ করল না। প্রজারা বলল, আমরা কী জানি ছাই যে, এ—জমিরও মালিক আছে। তবে আমরা নিমকহারাম নই, বঞ্চিত করব না।

দিন দুই বাদে দারুব্রহ্ম বাড়িতে ফিরে দেখে চারটে গোরুর গাড়ি বোঝাই ধান, দু—কলসি কাঁচা টাকা আর আনাজপাতি, তেল মশলা সব এসেছে। সেদিন দারুব্রহ্ম বাড়তি দশজনের রান্না রাঁধিয়ে প্রদীপ ঠুকে দৈত্যকে বের করে বলল, 'খাও বাপু, পেট ভরে খাও। এ—বাড়িতে অতিথির ঢেঁকুর ওঠে না, এ—কথা শুনলে আমার পূর্বপুরুষরা স্বর্গ থেকে অভিশাপ দেবে।'

কিন্তু উঠল কই? দশজনের ভাত সাবাড় করে দৈত্য করুণ মুখে বলল, 'বটে?'

দারুব্রহ্ম হাঁ হয়ে গেল।

রাত্রিবেলা বিশজনের খোরাক শেষ করেও কিন্তু দৈত্য ঢেঁকুর তুলল না। সাতদিনে চার গোরুর গাড়ির চাল শেষ। বাড়িসুদ্ধ লোক জেনে গেছে যে, এত খেয়েও দৈত্যটার ঢেঁকুর উঠছে না। তারা রোজ দুবেলা এসে খাওয়ার সময় দৈত্যকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, কবে কখন ঢেঁকুর ওঠে। কিন্তু উঠল না! কিন্তু ঢেঁকুর না উঠলেও পাহাড়—প্রমাণ খাওয়ার ফলে ক—দিনের মধ্যেই সুড়ুঙ্গে দৈত্যটার চেহারা পুরোপুরি ঘটোৎকচের মতো হয়ে উঠল। মুগুরের মতো হাত, পাটাতনের মতো বুক, মুলোর মতো দাঁত, তালগাছের মতো লম্বা।

দারুব্রহ্মেরও জেদ চেপেছে। তাদের এতবড়ো রাজবংশে একটা পুঁচকে দৈত্য এসে খেয়ে ঢেঁকুর তুলছে না — এ কেমন কথা! এ বাড়িতে ভোজ খেয়ে লোকে পাক্কা দেড়দিন মেঝেয় পড়ে থাকত। দু—চারজন ভোজ খেয়ে গঙ্গাযাত্রায় পর্যন্ত গেছে। সেই বাড়ির এই অপমান?

দারুব্রহ্ম নাওয়া—খাওয়া ভুলে আদায় উশুল করতে লাগল। তেলকলের ভার নিজে নিল। আরও সব নতুন নতুন কারবার খুলতে লাগল। গাড়ি—গাড়ি চাল আসছে বাড়িতে, বস্তা—বস্তা আনাজ, ঘি, দুধ, দই। এ সবই একদিন দৈত্যের ওপর দিয়ে উশুল হবে। আগে ব্যাটা ঢেঁকুরটা তো তুলুক।

এর মধ্যেই একদিন বাড়ির খদ্দের এসে হানা দিয়েছিল। তখন দুপুরবেলা, দারুব্রহ্ম প্রদীপ ঠুকে দৈত্যকে মাত্র খেতে ডেকেছে। দৃশ্যটা দেখে খদ্দের চেয়ারসুদ্ধ উলটে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। তারপর থেকে আর আসেনি। কিন্তু বাড়ি বিক্রি এখন মাথায় উঠেছে দারুব্রহ্মের। বিক্রির মানেও হয় না। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপটা যখন হাতে পেয়েছে তখন অভাবও থাকবে না। খামোখা পূর্বপুরুষের ভিটে বিক্রি করবে কেন? সে তাই মিস্ত্রি ডেকে বাড়িটা মেরামত করাতে লাগল। সব খরচই উশুল হবে।

মৌরসি পাট্টায় আরও কিছু জমি নিল দারুব্রহ্ম। চাষবাস বাড়িয়ে ফেলল। কারবারগুলোও বেশ ফেঁপে—ফুলে চলছে। গোশালায় গোরু, আস্তাবলে ঘোড়া, বাড়ির সামনে জুড়িগাড়ি। শুকনো বাগানে আবার গাছ

লাগানো হল, তাতে ফুল ফুটল। বাড়িটা কলি ফেরানোর পর আবার ঝলমল করতে লাগল! এর মধ্যেই দারুব্রহ্মের জন্য যে মেয়েটি দেখা হয়েছিল তার বাবা এসে হাতজোড় করে বলল, 'আমার মেয়েটি নিলে ধন্য হই।' তা তিনি হলেনও। নহবতখানায় সানাই বাজল, দারুব্রহ্ম বিয়ে করে এসে বিরাট ভোজ দিয়ে সাত গাঁয়ের লোককে খাওয়াল।

কিন্তু সাত গাঁয়ের লোকের মতো খাবার একা খেয়েও ব্যাটা দৈত্যটা কিন্তু ঢেঁকুর তুলল না। তবে বলল, 'খিদেটা এবারে একটু কমেছে। পেটের জ্বলুনিটা তেমন নেই।' বলে ফের ঘুমোতে চলে গেল। নতুন বউয়ের সামনে এই অপমানে কান লাল হয়ে উঠল দারুব্রহ্মের বলতে নেই সে এখন লাখোপতি। একটা দৈত্যের পেট ভরাতে পারবে না? পরদিন থেকে সে কাজকর্ম দ্বিগুণ করে দিল।

মাসখানেক বাদে সে একশো গাঁয়ের লোকের আয়োজন করে দৈত্যটাকে ডাকল। খুবই লজ্জার সঙ্গে প্রকাণ্ড চেহারার বিকট দৈত্যটা এসে বসল আসনে। আচমন করে একটু ভাত মেখে মুখে দিয়েছে কী দেয়নি অমনি একটা বাজ পড়ার আওয়াজে আঁতকে উঠল সবাই। ঘড় ঘড়াত। ঘড় ঘড়াত। ঘড় ঘড়াত। পরপর তিনবার। অমনি চারদিকে হইহুল্লোড় ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। বাচ্চচারা হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল। তুলেছে। তুলেছে। দৈত্য ঢেঁকুর তুলেছে।

মাথা নীচু করে দৈত্যটা উঠে পড়ল। আঁচিয়ে যখন প্রদীপের মধ্যে ঢুকতে যাবে তখনই গিয়ে দারুব্রহ্ম তাকে বলল, 'এই যে বাপু। এই দিনটারই অপেক্ষা করছিলাম। ঢেঁকুর তো তুললে, এবার তো কাজকর্ম কিছু করতে হয়।'

দৈত্যটা অবাক হয়ে চেয়ে বলল, 'আপনি হুকুম করলে সবই করতে হবে মালিক। কিন্তু কাজটা আর বাকি রেখেছেন কী? লোকে আমাকে পেলেই গাড়ি চায়, বাড়ি চায়, ধনদৌলত চায়। আমি দিইও। কিন্তু আপনার যা দেখছি, এর ওপরেও আমাকে কিছু করতে হবে নাকি?'

দারুব্রহ্ম কথাটা আগে ভেবে দেখেনি। এখন দেখল। বাস্তবিকই তার যা আছে তার ওপর আরও কিছু চাওয়ার মানেও হয় না। সে মাথা চুলকে বলল 'তা বটে। তবে কিনা—'

দৈত্যটা করুণ মুখ করে বলল, 'যে—বাড়িতে খেয়ে আমার ঢেঁকুর ওঠে, বুঝতে হবে সে—বাড়ির ত্রিসীমানায় কোনো অভাব নেই। ঝুটমুট আমাকে আর খাটাবেন কেন? দেড় হাজার বছরের ঘুমটা আর কয়েক হাজার বছর চালাতে দিন। শরীরটা বড়ো ম্যাজ—ম্যাজ করছে।'

দারুব্রহ্ম একটা শ্বাস ফেলে বলল, 'তাই হোক।'

দৈত্যটা প্রদীপের মধ্যে মিলিয়ে গেল। দারুব্রহ্ম সেটাকে আবার সাবধানে কাঠের সিন্দুকে ভরে রাখল।

দুই ভূত

লালু আর ভুলুর কোনো কাজ নেই। তারা সারাদিন গল্প করে কাটায়। সবই নিজেদের জীবনের নানা সুখ—দুঃখের কথা। কথা বলতে—বলতে যখন আর কথা কইতে ভালো লাগে না তখন দু—জনে খানিক কুস্তি লড়ে। তাদের কুস্তিও খুব একঘেয়ে— কেউ হারে না। কেউ জেতে না। কুস্তি করে তাদের ক্লান্তিও আসে না, ঘামও ঝরে না। তার কারণ লালু আর ভুলু দু—জনেই ভূত। প্রায় চোদ্দো বছর আগে দুই বন্ধু মনুষ্য জন্ম শেষ করে ভূত হয়ে লালগঞ্জের লাগোয়া বৈরাগী দিঘির ধারে আশ—শ্যাওড়ার জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে আছে। মামলা—মোকদ্দমা থেকেই বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে আশ্চর্যের বিষয়, বুড়ো বয়সে মাত্র সাত দিনের তফাতে লালু আর ভুলু পটল তোলে। ভূত হয়ে যখন দু—জনের দেখা হল তখন দু—জনের মনে হল পুরোনো ঝগড়া জিইয়ে রাখার আর কোনো মানেই হয় না। তাই দু—জনের বেশ ভালো ভাব হয়ে গেল। সময় কাটানোর জন্য তারা মাঝে—মাঝে ইচ্ছে করে ঝগড়া লাগানোর চেষ্টা করেও দেখেছে। কিন্তু দেখা গেল ঝগড়াটা তেমন জমে না, আরও একটা আশ্চর্যের বিষয় হল তারা ভূত হয়ে ইস্তক এ তল্লাটে কোথাও কখনো আর কোনো ভূতের দেখা পায়নি।

ভুলু বলে, 'হ্যাঁরে লালু, গাঁয়ে গত চোদ্দো বছরে তো বিস্তর লোক মরেছে, তাদের ভূতগুলো সব গেল কোথায় বল তো?'

'সেটা তো আমিও ভাবছি, আমরা ছাড়া আর কাউকে তো কখনো দেখিনি! আরও কয়েকজন থাকলে সময়টা একটু কাটত ভালো।'

'ব্যাপারটা কিন্তু বড্ড গোলমেলে।'

'আমারও ভালো ঠেকছে না! বেশিদিন এরকম চললে আমাদের এ গাঁ ছাড়তে হবে। সেটা কী সোজা! আমি গাঁ ছাড়ার চেষ্টা করে দেখেছি, ভারি সূক্ষ্ম একটা বেড়া আছে। চোখে দেখা যায় না এতই মিহি, সেই বেড়া ভেদ করা অসম্ভব।'

'বটে, এ তো ভারি অন্যায় কথা! আমরা কী সব জেলখানায় কয়েদি নাকি রে?'

'মনে হয় এক জায়গার ভূত অন্য জায়গায় গেলে হিসেবের গোলমাল হবে বলেই যমরাজা বেড়া দিয়ে রেখেছে।'

'তা অলপ্পেয়ে যমরাজাটাই বা কোথায়? আজ অবধি তো তার দেখাটি পেলাম না।'

'হবে রে হবে। এই একঘেয়ে বসে থাকাটা আমার আর ভালো লাগছে না। বরং গাঁয়ের ভূতগুলো কোথায় গায়েব হচ্ছে সেটা জানা দরকার। আরও গোটা কয়েক হলে দিব্যি গল্পটল্প করা যেত। দল বেঁধে থাকতাম—'

'তাহলে খুঁজেই দেখা যাক।'

'তাই চলো।'

দুই বন্ধু মিলে অতঃপর ভূত খুঁজতে বেরোল। কিন্তু খুঁজতে—খুঁজতে হয়রানিই সার হল। একটা ভূতের গায়ের আঁশও দেখা গেল না।

'বড়ো চিন্তার কথা হল রে লালু!'

'বটেই তো! এরকম তো হওয়ার কথা নয়।'

'একটা কথা বলি, যতীন মুৎসুদ্দির বয়স হয়েছে। অবস্থাও ক—দিন ধরে খারাপ যাচ্ছে। এখন—তখন অবস্থা। চল তো গিয়ে তার শিয়রে বসে থাকি। আত্মাটা বেরোলেই খপ করে ধরব'খন।'

'কথাটা মন্দ বলোনি। তাহলে চলো যাই।'

দু—জনেই গিয়ে যতীন মুৎসুদ্দির শিয়রে আস্তানা গাড়ল। খুব সতর্ক চোখে চেয়ে রইল যতীনের দিকে। যতীন বুড়ো মানুষ, শরীর জীর্ণ, শক্তিও নেই।

দু—দিন ঠায় বসে থাকার পরে তিনদিনের দিন যখন গভীর রাত তখন লালু আর ভুলু লক্ষ করল যতীনের আত্মাটা নাকের ফুটোর কাছে বসে সাবধানে বাইরে উঁকিঝুঁকি মারছে।

লালু চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই বেরোচ্ছে। সাবধান রে ভুলু, ঘ্যাঁচ করে ধরতে হবে কিন্তু।'

'হ্যাঁ, একবার বেরোক বাছাধন।'

তা আত্মাটা বেরোল বটে, কিন্তু ধরা গেল না। শরীর ছেড়ে হঠাৎ এমন চোঁ করে এরোপ্লেনের মতোই উড়ে গেল নাকের ফুটো দিয়ে যে লালু—ভুলু হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর 'ধর—ধর' করে ছুটল পিছনে।

যতীন মুৎসুদ্দির আত্মা সোজা গিয়ে গণেশ গায়েনের বাড়িতে ঢুকে পড়ল। পিছু—পিছু লালু আর ভুলু।

গণেশ গায়েন যতীনের আত্মাকে দেখেই একগাল হেসে বলল, 'এসেছিস, তোকে নিয়ে সাত হাজার সাতশো পনেরোটা হল। দাঁড়া যতেন, দাঁড়া তোর শিশিটা বের করি। মলমটলম ভরে একদম রেডি করে রেখেছি।' এই বলে একটা দু—ইঞ্চি সাইজের শিশি বের করে যতীনকে তার ভিতরে পুরে কয়েকটা নাড়া দিয়ে ছিপি বন্ধ করে তাকে রেখে দিল। তারপর আপন মনেই বলল, 'আর দুটো হলেই কেল্লা ফতে। পরশু ঝুনঝুনওয়ালা লাখখানেক টাকা নিয়ে আসবে। সাত হাজার সাতশো সতেরোটা হলেই লাখ টাকা হাতে এসে যেত। টাইফয়েড হয়ে চোদ্দো বছর আগে শয্যা নিতে হল বলে লালু আর ভুলুর ভূত দুটো হাতছাড়া হল, নইলে আমাকে আজ পায় কে! সে দুটোকে পেলে হত।'

লালু—ভুলু দরজার আড়ালে থেকে কথাটা শুনে ভয়ে সিঁটিয়ে রইল।

গণেশ গায়েন ঘুমোলে তারা ঘরের তাকে জমিয়ে রাখা সাত হাজার সাতশো পনেরোটা শিশি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখল প্রত্যেকটিতে একটা করে ভূত মলম মেখে ঘুমিয়ে আছে।

'লালু, দেখেছিস!'

'দেখছি রে ভুলু, কী করবি?'

'আয়, শিশিগুলোকে তাক থেকে ফেলে আগে ভাঙি।' তাই হল। দু—জনে মিলে নিশুত রাতে ঝনঝন করে শিশিগুলোকে ঠেলে ফেলে দিল মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত ভূতেরা জেগে মহা কোলাহল শুরু করে দিল।

ভুলু তাদের সম্বোধন করে বলল, 'ভাই—বোনেরা, তোমরা ভয় পেয়ো না, আমরা তোমাদের উদ্ধার করতেই এসেছি।'

সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল।

গণেশ গায়েনও ঘুম ভেঙে উঠে ধমকাতে লাগল, 'চুপ—চুপ বেয়াদব কোথাকার! তোদের তো মন্তর দিয়ে বেঁধে রেখেছি।'

কে শোনে কার কথা। ভূতেরা মহানন্দে চিৎকার করতে করতে লালু—ভুলুর সঙ্গে চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেল।

গণেশ দুঃখ করে বলল, 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় রে। কত ভালো কাজ হত তোদের দিয়ে। ঝুনঝুনওয়ালা তোদের নিয়ে গিয়ে তার আয়ুর্বেদ ওষুধের কারখানায় চোলাই করে কর্কট রোগের ওষুধ বানাত, তা তোদের কপালে নেই। তা আমি আর কী করব?'

আগন্তুক

নাদুবাবু বেজায় নাকাল হচ্ছেন। মানুষটি ভালো, প্রাণে বেশ দয়ামায়া আছে। কাঙাল ভিখিরি এসে দাঁড়ালে দূর—ছাই করতে পারেন না। মাথাপিছু একটি করে আধুলি বরাদ্দ করে রেখেছিলেন। তা আগে পাঁচ—সাতজন ভিখিরি নানা সময়ে আসত। কিন্তু ইদানীং সংখ্যাটা বেড়েছে। বাড়তে—বাড়তে গতকাল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ত্রিশ জন।

আজ সকালে নিজের ছোটো মনোহারির দোকানটা খুলে ধূপধুনো জ্বেলে গণেশবাবুকে পেন্নাম করে মুখ তুলে দেখেন, ওরে বাবা! দোকানের সামনে অন্তত জনা পঞ্চাশেক ভিখিরির লাইন। এই ফরাসগঞ্জে কোনোকালে এত ভিখিরি ছিল না! এল কোত্থেকে?

নাদুবাবু হাতজোড় করে বললেন, বাবা সকল, মা জননীরা, আজ আর আধুলিতে কুলোতে পারব না। একখানা করে সিকি নিয়ে যাও।

শুনে ভিখিরিরা বেজায় চেঁচামেচি জুড়ে দিল। একজন তো তেড়িয়া হয়ে বলে উঠল, এঃ, সিকি দেখাচ্ছেন? আমরা কী ভিখিরি নাকি?

তা গেল পঁচিশটা টাকা। নাদুবাবুর মুশকিল হল তিনি মোটেই রোখাচোখা মানুষ নন, স্পষ্টবক্তা নন, নিরীহ আর ভীতুও বটেন। ভিখিরিরা বিদেয় হল তো সুধীরবাবু এসে হাজির। রোজই হাজিরা দেন। টুকটাক জিনিস কেনেন। বলেন, খাতায় লিখে রাখো, মাসকাবারে দিয়ে যাব। তা আজ অবধি কত মাস যে কাবার হল তার হিসেব নেই। কিন্তু সুধীরবাবু ধারের একটি পয়সাও শোধ দেননি। টাকা না—দিলেও সুধীরবাবু উপদেশ দিয়ে থাকেন।

আজ বললেন, ওহে নাদু, তোমার ব্যবসার যে উন্নতি হচ্ছে না তার কারণ কী জানো? তোমার স্টকটা মোটেই সুবিধের নয়। ওরে বাপু, এ যুগে ভালো—ভালো জিনিস দিয়ে দোকান না সাজালে কী খদ্দের আসে? ভালো—ভালো ব্র্যান্ডের জিনিস কই তোমার? বিলিতি বিস্কুট, ফরাসি সেন্ট, জার্মান ব্লেড এসব না রাখলে এ দোকানের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

সেটা নাদুবাবুও জানেন। সুধীরবাবুর মতো আরও কয়েকজন খদ্দের আছে তাঁর। লক্ষ্মীরতন রায়, গগন চাটুজ্যে, মাধব কর্মকার। এরা সব মাতব্বর লোক। সুধীরবাবুর তবু একটু বিনয় আছে, এদের তাও নেই। যা খুশি জিনিস তুলে নিয়ে যায়। দাম শোধ দেওয়ার নামও করে না। নাদুবাবু লজ্জার মাথা খেয়ে তাগাদাও দিতে পারেন না কখনো।

তাঁর বউ নবলীলা এমনিতেই খাণ্ডার! তার ওপর নাদুবাবুর এইসব ভালোমানুষি আর আহম্মকি দেখে রোজ উস্তম—ফুস্তম করে দিনরাত বকাঝকা—গালমন্দ করে থাকেন। তা নাদুবাবু সেসবেরও কোনো সদুত্তর খুঁজে পান না।

তবে ফরাসগঞ্জের সব লোকই কিন্তু খারাপ নয়। তারা জানে নাদু সরকার নিরীহ সজ্জন মানুষ। দাম বা ওজনে কখনো ঠকায় না। তাই এই দোকানের কিছু বাঁধা খদ্দের আছে। তাদের ভরসাতেই নাদুবাবুর গ্রাসাচ্ছাদনটা কোনোরকমে চলে যায়।

একটু বেলার দিকে সুধীরবাবু বিদেয় হলেন। নাদুবাবু একা—একা বসে নিজের দুঃখের কথা ভাবতে লাগলেন।

এরপর দুটো—চারটে খদ্দের এল, দু—একজন কুশলপ্রশ্ন করে গেল। রমাকান্ত পুরুত এসে শান্তিজল ছিটিয়ে কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে দুটো টাকা নিয়ে গেল। তারপর খানিকক্ষণ ফাঁকা সময় যাচ্ছিল। তখন

দুটো কুকুরের ঝগড়া লাগল রাস্তায়। কিছুক্ষণ ঝগড়াটা দেখল বসে নাদু সরকার। গাঁ দেশে দেখার আছেটাই বা কী!

দুপুরের দিকে যখন নাদুবাবু উঠি—উঠি করছেন, ঠিক সেই সময় একটা হা—ঘরে চেহারার লোক এসে টপ করে উঠে সুধীরবাবুর পরিত্যক্ত টুলটায় বসে পড়ে বলল, বিড়ি আছে হে?

নাদুবাবু বললেন, না। বিড়িটিড়ি আমি রাখি না। ওসব হরির দোকানে পাবেন। বাঁ—হাতে একটু এগিয়ে যান, এই কদমতলার দিকে।

না হে, বিড়ির দরকার নেই। ওসব আমি খাই না।

তবে চাইলেন যে।

চাইনি তো! বললুম, বিড়ি আছে হে! তার মানে তো চাওয়া হয়!

তা বটে, তবে এরকমটাই মানে হয় আর কী!

জানতে চাওয়া আর চাওয়া কী এক হল বাপু?

নাদুবাবু মাথা নেড়ে বললেন, তা অবিশ্যি ঠিক।

লোকটা আধবুড়ো, রোগা। গালে খোঁচা—খোঁচা দাড়ি, দাঁত উঁচু। পরনে ময়লা একটা সাদা পিরান, হেঁটো ধুতি আর পায়ে লালচে রঙের ক্যাম্বিসের জুতো। বেশ আয়েশ করে বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুজে আছে।

এদিকে নাদুবাবুর খিদে পেয়েছে। বাড়ি গিয়ে চান করে চাট্টি খাবেন। কিন্তু লোকটাকে তো আর বিদেয় হতে বলা যায় না। তাই নাদুবাবু বারকয়েক ইঙ্গিতপূর্ণ গলাখাঁকারি দিলেন। তাতে কাজ হল না।

নাদুবাবু অগত্যা চুপ করে বসে করুণ চোখে দেখতে লাগলেন। লোকটার ঘুম কখন ভাঙবে তা কে জানে!

হঠাৎ লোকটা গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে বলল, ওহে, তোমার দোকানে পাঁউরুটি পাওয়া যায়?

যায়, তবে ফুরিয়ে গেছে।

আহা, ফুরিয়ে গেলে ক্ষতি কী? বলছিলাম পাওয়া যায় কিনা। আমার দরকার নেই, স্রেফ কৌতূহল।

যে আজ্ঞে।

আচ্ছা, ইসবগুলের ভুসি রাখো না তুমি?

আজ্ঞে না। বাজারের মদনের দোকানে ভুসি পেয়ে যাবেন। যান না, তিন মিনিটের পথ।

আহা, ইসবগুলের ভুসি দিয়ে আমার হবেটা কী? তা তুমি খড়কে রাখো? টুথপিক?

আজ্ঞে না। গাঁ দেশে কাঠির অভাব নেই। কে পয়সা খরচ করে টুথপিক কিনতে যাবে বলুন। তবে আপনার দরকার থাকলে—

আরে না—না। খাবারই জুটছে না তো খড়কে দিয়ে কী হবে?

কথাটা শুনে নাদুবাবুর একটু কষ্ট হল। তাঁর বড়ো দয়ার শরীর। বললেন, খাওয়া হয়নি বুঝি আপনার?

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, না হে বাপু। গত দিন দুয়েক খাদ্যবস্তুর সঙ্গে মোটে দেখাসাক্ষাৎই হচ্ছে না।

নাদুবাবু চিন্তায় পড়ে গেলেন। দু—দিনে উপোসী মানুষটাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পেট পুরে খাওয়াতে ভারি ইচ্ছে করছে। কিন্তু তাঁর বউ নবলীলা বড্ড মাথা গরম মানুষ যে! এমনিতেই তিনি নাদুবাবুকে মোটেই ভালো চোখে দেখেন না। অকারণেই ঝেড়ে কাপড় পরান। তার ওপর অসময়ে অতিথি নিয়ে গিয়ে হাজির হলে বারুদে আগুন লাগবে যে!

তাই আমতা—আমতা করে বললেন, তা ইয়ে, বিস্কুট খেয়ে দেখবেন? ভালো বিস্কুট আছে কিন্তু! কয়েকখানা খেয়ে একটু জল খাওয়ার পর খিদে জব্দ হয়ে যাবে।

লোকটা মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে বলল, বিস্কুট! ছো! ও আমি জীবনে খাইনি। বিস্কুট আর কাঠের গুঁড়োয় তফাত কী বলো তো! ওসব ফিনফিনে জিনিস আমি দু—চোখে দেখতে পারি না।

নাদুবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তাহলে আর কী করা, আমার কাছে তো বেশি নেই। এই দশটা টাকা নিয়ে যান। যা হোক কিছু কিনেটিনে খাবেন।

দশ টাকা? বলে লোকটা ভারি অরুচির সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, দশ টাকা আবার টাকা? ও তুমিই রেখে দাও।

অপ্রতিভ নাদুবাবু অগত্যা ড্রয়ার আর পকেট হাতড়ে যা পেলেন তা গুণে নিয়ে লোকটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই যে, কুড়িটা টাকা নিয়ে যান। আমার কাছে আর নেই কিন্তু।

লোকটা উদাস চোখে রাস্তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, কুড়ি টাকায় কী হয় বলো তো এই বাজারে?

কিন্তু আমার আর নেই যে!

লোকটা নাদুবাবুর দিকে একঝলক তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হেনে বলল, আহা, খুঁজে দেখতে দোষ কী? আরও তিনটে ড্রয়ারের টানা খুলে দেখোই না কিছু বেরোয় কিনা।

ওসব আমার দেখা। তবু যখন বলছেন তখন দেখছি। কিন্তু কিছু নেই, আগেই বলে রাখছি।

নাদুবাবু দ্বিতীয় ড্রয়ারটা খুলে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে গিয়ে হঠাৎ দেখলেন তিনখানা পাঁচশো টাকার নোট এক জায়গায় পড়ে আছে। তাজ্জব হয়ে টাকাটা বের করে চেয়ে রইলেন। বললেন, ও বাবা! এ তো দেখছি দেড় হাজার টাকা? কবে মনের ভুলে রেখেছিলাম কে জানে! তা আপনার কপালেই যখন পেলাম, তখন এ টাকাও আপনি নিয়ে যান।

লোকটা দেড় হাজার শুনেও তেমন উৎসাহ দেখাল না। ঠোঁট উলটে বলল, দেড় হাজার তো ফুঁয়ে উড়ে যায়। ওহে বাপু, আরও তলিয়ে দেখো। ভালো করে খুঁজলেই না তুমি। আরও দুটো ড্রয়ার তো পড়ে রইল। কোনো কাগজের ভাঁজে কী আছে তা কী বলা যায়?

নাদুবাবু তাড়াতাড়ি তৃতীয় ড্রয়ারটাও খুললেন। মেলা কাগজপত্র দিয়ে ঠাসা ড্রয়ারটা। খুঁজতে খুঁজতে পুরোনো ক্যাশমেমোর বইয়ের ফাঁক থেকে আরও হাজার দুই টাকার ন্যাতানো নোট বেরিয়ে পড়ল। নাদুবাবু হাসতে—হাসতে বললেন, অশৈলী কাণ্ডই বটে! এ যে দু—হাজার টাকা! নাঃ, আপনার কপালটা ভালোই বলতে হবে।

দূর! দূর! ও আর এমনকী? আঁতিপাঁতি করে দেখো হে! দেখার চোখ থাকলে কত কী বেরিয়ে আসে!

তা, বলতে নেই, বেরোলোও। গুনে গেঁথে নাদুবাবু অবাক হয়ে দেখলেন, মোট পাঁচ হাজার। এত টাকা বহুকাল একসঙ্গে দেখেননি তিনি। একটা শ্বাস ফেলে বললেন, না মশাই, এ অবিশ্বাস্য কাণ্ড। তা আপনার কথাতেই যখন পাওয়া হল, তখন এ টাকা আপনাকেই দিচ্ছি। নিন।

লোকটা ভারি বিরাগের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, টাকাপয়সা দিয়ে আমার হবেটা কী? আমি কি তোমার কাছে চেয়েছি নাকি?

আপনিই তো খুঁজতে বললেন!

লোকটা মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে বিরক্ত গলায় বলে, খুঁজতে বলেছি বলেই কী টাকা নিতে হবে নাকি?

আহা, আপনার খিদে পেয়েছে বলছিলেন যে!

লোকটা খিঁচিয়ে উঠে বলে, তাতে তোমার কী? আমার খিদে নিয়ে তোমায় ভাবতে বলেছে কে? পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে খুব গুমোর হয়েছে দেখছি! আমাকে টাকা দেখাচ্ছ।

নাদুবাবু কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, আপনি রাগ করবেন না। আচ্ছা, আপনি কি অন্তর্যামী?

কোন দুঃখে অন্তর্যামী হতে যাব?

আমতা—আমতা করে নাদুবাবু বললেন, না, আপনার যা দূরদৃষ্টি দেখছি তাতে মনে হল আর কী?

লোকটা উঠে পড়ল। বলল, চারদিকে নজর রেখে চলতে হয় বাপু। আর সেই কথাটাই বলার জন্য আসা। আমার কথা হয়ে গেছে, চললুম।

বলে লোকটা দোকান থেকে বেরিয়ে হনহন করে ছুটে চলে গেল।

নাদুবাবুর চোখ গোল, মুখ হাঁ।

নির্জন স্টেশনে

রূপনগর স্টেশনটা এমনিতেই ছোট্ট। ব্রাঞ্চ লাইন বলে লোকজনেরও বিশেষ গতায়াত নেই। সন্ধ্যের পর ছোট্ট স্টেশনঘরে কেরোসিনের বাতি জ্বলে। প্ল্যাটফর্মে সে বালাইও নেই। ঝুপসি ঝুপসি গাছে আচ্ছন্ন প্ল্যাটফর্মটায় অন্ধকার যেন ঝুলে ঝুলে দোল খায়। হেমন্তের কুয়াশার ভিতর দিয়ে দূরে সিগন্যালের লাল আলো আকাশ—প্রদীপের মতো জ্বলে থাকে। একজোড়া রেললাইন তেপান্তর থেকে তেপান্তরের দিকে উধাও হয়ে গেছে।

হেমন্তেই এই অঞ্চলে শীত পড়ে গেছে। কুয়াশাও যেন গাঢ়।

পিয়াল টিকিট কাটতে গিয়ে দেখল, কাউন্টারে লোক নেই। অনেক ডাকাডাকির পর একজন রোগা বুড়ো মানুষ এসে টিকিট দিল।

পিয়াল শুনেছে, কুসুমপুর যাওয়ার গাড়ি সাতটা কুড়িতে। যটাতেই হোক, পিয়ালের কিছু যায় আসে না। আজকাল সে উদভ্রান্তের মতো কোথায় যাচ্ছে, কী করছে তার কিছুরই ঠিক নেই।

পিয়াল নির্জন অন্ধকার শীতার্ত কুয়াশাচ্ছন্ন প্ল্যাটফর্মের একটা বেঞ্চে এসে বসল, সে যে কতখানি ক্লান্ত তা বসবার পরই যেন টের পেল। সারাদিন রোদে রোদে, ধুলোয়, মাঠে ঘাটে কত মাইল ঘুরেছে যে তার হিসেব নেই। মউলি বলে একটা জায়গায় একটা ছোট্ট হোটেলে দুপুরে ভাত খেয়েছিল। এখন সে পেটে খিদের কষ্টও অনুভব করছে। কিন্তু এসব কষ্ট এখন তার কাছে কিছুই নয়। গত দিনদশেক যাবৎ সে এইরকমভাবেই সাতসকালে কোনো অচেনা জায়গার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। তারপর উদভ্রান্তের মতো সারাদিন ঘোরে। রাতে কুসুমপুরে ফিরে যায়। বাড়ির লোকজন, বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতদের কাছে মুখ দেখাতেও তার লজ্জা করে।

ঘটনাটা তার পক্ষে লজ্জাজনকই। দিন কুড়ি আগে নীপা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। মা—বাবার সম্বন্ধ করা মেয়ে। নীপা দেখতে ভারি সুন্দর, ঢলঢলে এবং নম্র স্বভাবের। তাকে ফুলশয্যায় রাতে ভারি পছন্দও হয়ে গেল পিয়ালের। কিন্তু মুশকিল হল কেন যেন বড্ড কাঁটা হয়ে থাকছিল নীপা। শরীর ছুঁতে দিচ্ছিল না। কিছু মেয়েলি অজুহাত দেখাল। মিশ খেতে চাইছিল না তার সঙ্গে। মেয়েদের ব্যাপারে পিয়ালের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। সে চিরকাল লেখাপড়া আর খেলাধুলা নিয়ে থেকেছে। মেয়েদের সে একটু এড়িয়েই চলত। ভাবল, মেয়েরা বুঝি এরকমই হয়। থাক, হয়তো সময় লাগবে। দিনদশেক আগে এক রাতে নীপা শোওয়ার ঘরে হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে যা বলল তার মর্মার্থ হল, সে একটি ছেলেকে ছেলেবেলা থেকে ভালোবাসে, তাকে ছাড়া...ইত্যাদি। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল পিয়ালের। কাউকে ভালোই যদি বাসে তা হলে আর একজনকে বিয়ে করল কেন?

নীপা যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায়, ছেলেটা বেকার এবং পাড়ায় সুনাম নেই বলে তার কথা উত্থাপনই করতে পারেনি সে। বাবা আর মায়ের ভয়ে বিয়ে করেছে বটে, কিন্তু এখন বিষ খাওয়া ছাড়া তার উপায় নেই। পিয়াল কী তাকে একটু বিষ জোগাড় করে দিতে পারে? পিয়াল পারেনি, বিষের খবর সে রাখে না, রাখলেও সে নীপাকে মরবার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারত না।

তা হলে উপায়?

উপায় একটাই। পিয়াল তাকে বলল, ওই ছেলেটির সঙ্গেই গিয়ে সে ঘর বাঁধুক, তার আপত্তি হবে না।

প্রদীপ নামে সেই ছেলেটির কাছ অবধি নীপাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এল পিয়াল। গ্লানিতে মনটা ভরা, তার চেয়েও বড়ো কথা নীপাকে তার বড়ো ভালো লেগেছিল।

ব্যাপারটা জানাজানি হতে দেরি হল না। পিয়াল তেমন প্যাঁচালো বুদ্ধির মানুষ নয়। সাজিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলতেও পারে না। কী হয়েছে তা বুঝে বাড়ির লোক তুমুল একটা হই—হট্টগোল বাধিয়ে তুলল।

পিয়ালের শ্বশুরবাড়িতেও পড়ে গেল হুলস্থুল।

উদভ্রান্ত পিয়াল তাই গত দশ দিন যাবৎ বাড়ি থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কী করা উচিত ছিল তার, তা সে জানে না। যা উচিত বলে মনে হয়েছে তাই করেছে। কিন্তু লোকে বলছে অত সহজে নীপাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি তার। এমনকী নীপার বাবা এসে অবধি বলে গেছে, ওকে জুতোপেটা করোনি কেন? জলবিছুটি দাওনি কেন? বিষ চেয়েছিল, তো তাই দিলে না কেন? মরলে আমার হাড় জুড়োত।

বিভ্রান্তিটা আজও পিয়ালের মাথায় ভর করে আছে। গত দশ দিন যাবৎ সে তার মনোহারী দোকানটা খোলেনি। গত দশ দিন সে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করেনি। গত দশ দিন যাবৎ সে শুধু ভোর থেকে গভীর রাত অবধি চেনা—জানা পরিবেশ ছেড়ে অচেনা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রূপনগর জায়গাটাতেও সে এই প্রথম এল। সারাদিন ঘুরেছে, তবু সে বলতে পারবে না জায়গাটা কেমন। সে কিছুই দেখেনি। সে কিছুই ভালো করে বুঝতে পারছে না আজকাল। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কয়েকটা বেঞ্চ রয়েছে। রেলের মজবুত বেঞ্চ। কেউ নেই। তবু প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে একেবারে অন্ধকারে ঝুপসি একটা গাছের নীচে একটা বেঞ্চে ক্লান্ত শরীরে বসে রইল সে। পৌনে সাতটা বাজে, সাতটা কুড়ির ট্রেন আসতে দেরি আছে। না এলেও ক্ষতি নেই। সে বেঞ্চে সারারাত বসে থাকতে পারবে।

চোখ বুজে ভাবছিল পিয়াল। ভাবনার যেন শেষ নেই, বুকে একটা দাউ দহন যেন সবসময়ে রাবণের চিতার মতো জ্বলছে। লজ্জাটা যেন তারই। তার কোনো দোষ নেই, তবু সবসময়ে নিজেকেই তার অপরাধী বলে মনে হয়। সে আসলে নিজের কাছ থেকেই পালানোর চেষ্টা করছে। পেরে উঠছে কী? বেঞ্চের অন্য প্রান্তে যে আর একটা লোক বসে আছে সেটা সে লক্ষই করেনি। ঘড়ি দেখতে গিয়ে আচমকা নজরে পড়ল। না, পিয়াল চমকাল না, ভয় পেল না, কোনো প্রতিক্রিয়াও হল না। সে বরং মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে ফের চোখ বুজে ভাবতে লাগল। ভাবা মানে মাথার ভিতর যেন এক দীর্ঘস্থায়ী ঘূর্ণিঝড়। তাতে নানা কথা, নানা ঘটনা, নানা স্মৃতির এলোমেলো টুকরো উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তন্দ্রার মতো এসেছিল। চটকা ভেঙে প্রথমেই লোকটাকে দেখল। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। শুধু বোঝা যাচ্ছে, একজন বসে আছে। সে চুপচাপ, লোকটাও চুপচাপ। দু—জনেই পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে বেঞ্চের দু—ধারে। কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না পিয়ালের। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া অচেনা মানুষের সঙ্গে গত দশ দিন কথাই বলেনি সে। কিন্তু মুখে কথা না বললেও তার মনে কিন্তু সর্বদাই নানা কথার বুদবুদ তৈরি হচ্ছে, ভেসে আসছে কাল্পনিক সংলাপ, উঠে আসছে নানা বিতর্ক। এসব কথার বেশিরভাগটাই হচ্ছে নীপার সঙ্গে। নীপা— যাকে সে ঘটনা না জেনেই খুব ভালোবেসে ফেলেছিল, সেই ভালোবাসা প্রত্যাহার করে নিতে হল বোকার মতো। সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হলও না সে। সাত সাতটা ঘোড়ার লাগাম টেনে টেনে ফেরানোর চেষ্টা করছে পিয়াল।

যে অন্ধকারে আমাকে ফেলে গিয়েছ, সেই অন্ধকারই একদিন গ্রাস করবে না তোমাকেও?

নিজের কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই চমকে উঠল পিয়াল। এ কী? সে যে আপনমনে কথা বলছে! পাগলামির লক্ষণ নয় তো?

চকিতে সে একবার লোকটির দিকে তাকাল। শুনেছে নাকি? শুনলে খুবই লজ্জার কথা। আর একবার ঘড়ি দেখল পিয়াল। ঘড়ির কাঁটা যেন এক জায়গাতেই থেমে আছে! মাঝে মাঝে সময় যে কেন এত ধীরে চলে কে জানে?

ঘড়ি দেখে ফের চোখ বুজল পিয়াল। সারাদিনের ক্লান্তি ঘুম হয়ে নেমে আসছে চোখে। মেয়েরা তো পৃথিবীর ফুল। নীপা, তুমিই শেখালে আমাকে মেয়েদের ঘেন্না করতে, ভয় করতে। আর কোনো মেয়েকেই কখনো বিশ্বাস হবে না আমার।

ফের চমকে ওঠে পিয়াল! এ কী! এ যে তার নিজের পরিষ্কার কণ্ঠস্বর শুনল সে। হ্যাঁ, সে কথা বলছে, আপনমনে কথা বলছে!

লোকটার দিকে ফের তাকাল পিয়াল।

পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। বড্ড আবছা দেখাচ্ছে লোকটাকে। এত আবছা যে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, ওখানে কেউ নেই, সে ভুল দেখছে। লোকটা কী শুনল তার কথা? ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জার কথা!

পিয়াল উঠে পড়ল এবং প্ল্যাটফর্মের আর এক প্রান্তে আরও অন্ধকার একটা কোণে কুয়াশায় ভেজা বেঞ্চে বসল এসে। তার একা থাকা দরকার। জনসমাজে লোকসমক্ষে তার থাকা উচিত নয়। সে একা একা কথা বলছে। লোকে তাকে পাগল ভাববে।

ফিরেই যাবে যদি তবে কেন উন্মোচন করেছিলে এ হৃদয়? কেন ভালোবাসায় ভেসে গিয়েছিল বুক! তুমিই তো! তুমিই তো জিয়নকাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছিলে! খুলে দিলে বন্ধ দরজা। অন্য লগ্না, তোমার এ অপরাধ কে

ক্ষমা করবে বলো!

আধোঘুম থেকে ফের ধড়মড় করে উঠে বসল পিয়াল। এসব কী হচ্ছে? কেন কথা কইছে সে?

চট করে সে বেঞ্চের অন্য প্রান্তে চেয়ে দেখল। দেখে থ হয়ে গেল সে। কুয়াশায় মাখা প্রগাঢ় অন্ধকারে আবছায়ায় ওই তো বসে আছে লোকটা! আশ্চর্য! আশ্চর্য! ভালো বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু মনে হচ্ছে, সেই লোকটাই। কালো ঝাঁপার মুড়ি দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। অবিকল একইরকম দেখাচ্ছে।

বড্ড পাগল পাগল লাগছে পিয়ালের। সে উঠে পড়ল এবং বেঞ্চ বদল করে আর একটা বেঞ্চে গিয়ে বসল, তারপর ক্লান্তিতে চোখ বুজে ঘুমে ঢুলে পড়ল।

আমি আর কোথাও যাই না, কোথাও ফিরি না, আমার রাত নেই, দিন নেই। সময় থেমে আছে, ভিতরে দেখ, ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত যতেক নির্মাণ, ঝড়ে ভেঙে যাওয়া এক জাহাজ যেন অসহায় ভেসে যাচ্ছে স্রোতে। পৃথিবীর সব আলো নিবে গেল নাকি? উৎসবের শেষে লণ্ডভণ্ড বাড়িটাকে দেখেছ, এঁটোকাঁটা নিয়ে নেড়ি কুকুরের খেয়োখেয়ি। আমার ভিতরটা তেমনি এক উৎসব শেষের মণ্ডপ।

তটস্থ হয়ে সোজা হল পিয়াল। স্পষ্টই তার কণ্ঠস্বর। কেন সে কথা বলছে? কেন বলছে? কাকে বলছে?

চকিতে বেঞ্চের অন্য প্রান্তে দৃষ্টিক্ষেপ করল সে, এবং হঠাৎ তার শীত করে উঠল, লোকটা বসে আছে নাকি? আছেই তো মনে হচ্ছে! কালো ঝাঁপারে মুড়িসুড়ি দিয়ে ওই তো! লোকটা কী বার বার তার সঙ্গেই বেঞ্চ বদল করে এসে কাছে বসে থাকছে! একটাই লোক! নাকি আলাদা আলাদা?

কে জানে! পিয়ালের মনে হল একা একা কথা বলার চেয়ে বরং কারও সঙ্গে কথা বলাই ভালো। তার ইচ্ছে হচ্ছে না বটে, কিন্তু নিজের কাছ থেকে রেহাই পেতে হলে এটাই একমাত্র পথ।

পিয়াল লোকটার দিকে চেয়ে বলল, আপনি কি রূপনগরের লোক?

জবাবটা এল খানিকক্ষণ পরে। ঠিক গলার স্বরও নয়, যেন বাতাসের একটা কম্পনের ভিতরে খুব ফিনফিনে শব্দের আভাস মাত্র।

লোকটা যেন বলল, না।

তবে আপনি কোথাকার লোক?

তেমনি সংকেতের মতো, বাতাসের ঘনীভূত একটা কম্পনের মতো জবাব এল, অনেক দূরের।

এ জায়গায় বুঝি কাজে এসেছেন, নাকি বেড়াতে!

ডিউটি করছি।

ডিউটি! ওঃ তাই বলুন! কীসের ডিউটি? রেলের?

না।

তা হলে?

নজর রাখছি।

নজর রাখছেন? কী আশ্চর্য! নজর রাখছেন?

হ্যাঁ।

কার ওপর? এখানে তো কেউ নেই?

আপনি আছেন।

আমি! আ—আমি! আপনি কি আমার ওপর নজর রাখছেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন?

ওটাই আমার ডিউটি।

আপনি কে?

চিনবেন না।

কে আপনাকে আমার ওপর নজর রাখতে বলেছে?
ডিউটি।
ডিউটি! ডিউটি কথাটার তো মানেই হয় না। কীসের ডিউটি? কার ডিউটি?
ডিউট শুধু ডিউটিই।
আপনি বললেন নজর রাখছেন। ভালো কথা। তার মানে কি আমি বিপদে পড়লে বা আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলে আপনি আমাকে বাঁচাবেন? নাকি আপনি নজর রাখছেন আমাকে ফাঁসিয়ে দেবেন বলে।
তা জানি না, আমাকে শুধু নজর রাখতে বলা হয়েছে।
কে বলেছে?
জানি না।
জানেন না? না বলতে চাইছেন না?
জানলে বলতে পারতাম।
কবে থেকে নজর রাখছেন?
প্রথম থেকে।
প্রথম বলতে?
জন্ম থেকে।
জন্ম! সে কী!
আমি আর আপনি একই সঙ্গে জন্মেছি।
আপনি আসলে কে?
চিনবেন না।
দম ধরে খানিকক্ষণ বসে থাকে পিয়াল।
তারপর বলে, আপনি কি আমাকে চেনেন?
চিনি।
আমি কে?
পিয়াল রায়।
আশ্চর্য! আমার বাড়ি কোথায়?
কুসুমপুর।
আমার বাবার নাম?
হরিবল্লভ রায়।
আপনি কি আমার স্ত্রীর নাম জানেন?
জানি। নীপা রায়।
আপনি কি জানেন আমার স্ত্রী আমাকে ভালোবাসে না। প্রদীপকে বাসে!
জানি।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিয়াল বলে, আপনি সবই জানেন। কিন্তু আমি যে আপনার কিছুই জানি না।
জানবার কিছু নেই।
আপনি আমার সঙ্গেই জন্মেছিলেন?
হ্যাঁ।
আপনার বাড়ি কোথায়?
কোথাও নয়। আপনি যেখানে আমিও সেখানে।
বাঃ, বেশ কথা। কিন্তু আমি যে আজই আপনাকে প্রথম দেখলাম।

দেখলেন?
হ্যাঁ তো! এই যে দেখছি!
দেখছেন না। অনুমান করছেন।
আপনি কি বাস্তব নন?
বাস্তব।
রিয়েল?
রিয়েল।
আমি আপনাকে ছুঁয়ে দেখতে পারি?
না।
কেন?
ছোঁওয়া যায় না বলে।
হঠাৎ দূরের ফাঁকা মাঠঘাট থেকে হাহাকারের মতো একটা বাতাস বয়ে গেল। তার ভিতরে বিরহের হু হু শব্দ, প্রেতিনীর দীর্ঘশ্বাসের মতো, আর জলজ উদ্ভিদের গন্ধ, আর চোরা শীত।
আপনি জাদুকর নন তো?
না।
গোয়েন্দা?
না।
আপনি কি আমার ভারাক্রান্ত হৃদয়ের কথা জানেন?
জানি।
তাহলে আপনার কাছে সব কথা বলা যায়, যায় না?
ইচ্ছে হলে।
বড়ো গ্লানি, বড়ো অপমান। এত পালিয়ে বেড়াচ্ছি, ঘুরে মরছি, কই একটুও তো ভুলতে পারি না। শুনেছি সময়ের প্রলেপে সব ঢাকা পড়ে যায়, যাচ্ছে না তো!
কী ভুলবেন?
গ্লানি, অনুশোচনা, সব ভুলতে চাই। পারছি না, বুকে এত জ্বালা!
জানি।
কী করব?
জানি না।
যদি মরতে চাই?
একটা মেয়ের জন্য?
হ্যাঁ।
একটা তুচ্ছ মেয়ের জন্য?
ধরুন, তাই।
একটা দীর্ঘশ্বাস ভেসে এল।
শুনছেন?
শুনছি।
আজ রাতটি বড্ড মনোরম, অন্ধকার, রহস্যময় কুয়াশা, ভূতুড়ে একটা স্টেশন, আর প্রেতলোক থেকে আসা কারও মতো আপনি। এইসব আমাকে প্ররোচিত করছে মরার জন্য। মরলে সব শেষ, সব শান্তি, সব সমাধান।

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস।
সাতটা কুড়ির ট্রেন এত দেরি করছে কেন বলুন তো!
ট্রেন আসবে।
ওই ট্রেনের চাকায় যদি নিজেকে সমর্পণ করে দিই?
কোনো জবাব নেই।
আপনি কি আছেন?
আছি।
আপনি কি সবসময়ে আমার সঙ্গে থাকেন?
থাকি।
আচ্ছা, লাইনের ওপর দিয়ে ওটা কী আসছে বলুন তো!
একটা ট্রলি।
ট্রলি! ট্রলি কেন আসছে?
আপনার জন্য।
আমার জন্য? ট্রলি করে আমি কোথায় যাব?
দু—বছর পর।
দূর? কী যে বলেন!
ট্রলি সামনে এসে দাঁড়াল, লোকটা বলল, উঠে পড়ুন।
ভারি মজা পেল পিয়াল। ট্রলিতে সে জীবনে কখনো ওঠেনি, উঠবে? অদ্ভুত ঘটনা এটা, তবু পিয়াল হঠাৎ ট্রলিতে উঠে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ধুন্ধুমার বেগে ট্রলিটা ছুটতে শুরু করল।
কোথায় যাচ্ছি মশাই, অ্যাঁ! কোথায় যাচ্ছি সত্যিকারের!
দু—বছর পর, লোকটা পেছন থেকে বলল।
এর কোনো মানেই হয় না, কী হচ্ছে এসব?
দেখা যাক।
ট্রলি লাইন ছেড়ে কোথা দিয়ে যে কোথায় চলল তা বুঝতেই পারছিল না পিয়াল, কিন্তু সে একটা ঘরে পৌঁছে গেল, তার নিজেরই ঘর। ঘরে আলো জ্বলছে। ভারি সুন্দর মুখশ্রীর একটা মেয়ে খাটে বিছানা পাতছে, বালিশ সাজাচ্ছে। তাকে দেখে খুশির হাসি হেসে বলল, ও মা, তুমি এসে গেছ?
নীপা!
দেরি দেখে যা ভাবনা হচ্ছিল!
কিন্তু প্রদীপের কী হল, নীপা?
নীপা ভ্রূ কুঁচকে অভিমানী মুখ করে বলল, আচ্ছা, হঠাৎ আবার ও কথা কেন বলো তো! কতবার তো বলেছি, ও আসলে আমাকে চায়নি, চেয়েছিল দু—দিন ফুর্তি করে কেটে পড়তে। আমি তাই ওকে আমার শরীর ছুঁতে দিইনি, পালিয়ে গেছি মামার বাড়িতে। মামাও তো বলেছে তোমাকে! বলেনি? তবে কেন আজও বিশ্বাস করো না আমাকে? কেন করো না?
আবেগভরে কী একটা বলতে যাচ্ছিল পিয়াল। কিন্তু আচমকা ছবিটা মুছে গেল। জলার দিক থেকে প্রেতিনীর শ্বাসের মতো একটা বাতাস বয়ে এল। তাতে হাহাকারের শব্দ। অন্ধকার প্ল্যাটফর্মে বসে আছে পিয়াল।
এটা কি সত্যি?
কে জানে?
তবে দেখলাম কেন?

হতেও পারে তো! জীবনে কত সম্ভাবনা থাকে!
মিথ্যেও হতে পারে তো!
পারে।
কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে বুঝব কী করে?
অপেক্ষা করা যাক।
অপেক্ষা?
অপেক্ষা।
দূর থেকে একটা আলো এসে পড়ল রেললাইনের ওপর। চকিত উদ্ভাস, প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়ল সেই আলো। পিয়াল চেয়ে দেখল বেঞ্চের কোণে কেউ নেই। কেউ হয়তো ছিলই না। বিভ্রম।
পিয়াল ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, ট্রেন আসছে।

—